পঞ্চম অধ্যায়

তিনশিল্পীর তুলনা : জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, কমলকুমার মজুমদার, নরেন্দ্রনাথ মিত্র

ভূমিকা :

যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের অভিনব শাখা ছোট গল্পেরও ক্রমশ পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন ঘটেছে। এই পরিবর্তনের মূলে রয়েছে সমাজের দ্রুত পরিবর্তন। শিল্পীদের জীবন দর্শন ও উপলব্ধির ভিন্নতা এবং রচনা কৌশলের নতুন-নতুন পরীক্ষা। এরই ভিত্তিতে আলোচ্য সমকালীন তিন শিল্পীর ছোট গল্পগুলির তুলনা করা যেতে পারে। এই তুলনা করা যায় - তিন শিল্পীর জীবন সম্পর্কে, গল্পের বিষয়গত দিক থেকে, ভাষাগত দিকে এবং আঙ্গিকগত দিকে।

তুলনা : (১)

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, কমলকুমার এবং নরেন্দ্রনাথ মিত্রের জন্মের তারিখ হিসেব করলে দেখা যায়, এরা তিনজনেই প্রায় কাছাকাছি সময়ের মানুষ। এই তিন গল্পকারের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ হলেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, তাঁর জন্ম ১৯১২ সালে। কমলকুমারের ১৯১৪ সালে এবং নরেন্দ্র-নাথের ১৯১৭ সালে জন্ম। এই গল্পকারেরা একটি বিশেষ সময়ের মানুষ, যে সময়ে সমাজ জীবন চরম অর্থনৈতিক সংকটে, দেশবিভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, বেকার সমস্যা এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিপর্যস্ত। কাজেই এদের গল্পে সমাজের এই সমস্যার কথা পুনঃ পুনঃ উত্থাপিত হয়েছে। তিন গল্পকারই স্বভাবের দিক থেকে ছিলেন কবি। জ্যোতিরিন্দ্র এবং নরেন্দ্রনাথের শৈশব কেটেছে পূর্ববাংলার গ্রামাঞ্চলে। তাই এই দুই শিল্পীর গল্পে প্রকৃতি তার অতুল ঐশ্বর্য নিয়ে ধরা দিয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্র এবং নরেন্দ্রনাথ প্রথম জীবন গ্রামাঞ্চলে কাটিয়ে পরবর্তী সময়ে বা যৌবনে এসেছেন কলকাতায়। এই শহরের জীবনে দুই শিল্পীই প্রথমে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য খুব একটা পাননি। এবং একই কাজে জীবিকার ক্ষেত্রে কখনোই স্থির থাকেননি। জ্যোতিরিন্দ্রের মধ্যে জীবিকার জন্য কর্মক্ষেত্রে অস্থিরতা অনেক বেশি ছিল নরেন্দ্রনাথের থেকেও। কর্মক্ষেত্রে এই অস্থিরতা কমলকুমারের মধ্যেও ছিল। কমলকুমারের পিতার একটি বাড়ি ছিল সাঁওতাল পরগণার রিখিয়ায়, যেখানে অবসর সময় কাটাতে তারা আসতেন। তাছাড়া কলকাতাতে রাসবিহারী

এ্যাভিনিউয়ে বাড়ি ছিল। কিন্তু গ্রামের প্রতি তার আকর্ষণ প্রবল ছিল, সেটা বোঝা যায় একটি ঘটনায়, বিশ্ববিখ্যাত চিত্র পরিচালক জাঁ রেনোয়া কলকাতায় 'দি রিভার' ছবি করার কাজে এলে কমলকুমার তাঁকে বলেছিলেন রিষিয়ায় যাবার কথা, কারণ সেখানে রয়েছে "Plenty of sun, plenty of rain and innumerable silence'[১]. জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এবং নরেন্দ্রনাথ মিত্র স্বভাবের দিক থেকে উভয়েই ছিলেন একচোরা ধরনের মানুষ, বলা যায় লাজুক প্রকৃতির। কিন্তু কমলকুমার খুব সহজেই যে কোন পরিবেশে আড্ডা জমিয়ে নিতে পারতেন।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র এবং জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী দুজনেই পূর্ববাংলায় কৈশোর কাটিয়েছেন। নরেন্দ্রনাথের গল্পে বারে বারেই পূর্ববাংলার স্মৃতি, সেই গ্রামের পথ-ঘাট, মানুষ তাদের মুখের ভাষাকে নিয়ে উঠে এসেছে। নরেন্দ্রনাথের মধ্যে একটা পিছন ফিরে দেখার প্রবণতা ছিল। পুরনো ঐতিহ্য ও ধারার ভাঙনে একটা বেদনাবোধ তাঁর রচনায় দুর্লক্ষ্য নয়। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর মধ্যে এই পিছন ফিরে দেখার প্রবণতা একেবারে নেই বললেই চলে। পারিবারিক জীবনে কমলকুমার খুব একটা সুস্থির মধ্যে ছিলেন না। দাম্পত্য জীবনের এই দ্বিধার কথা তিনি তার ডাইরীতে উল্লেখ করেছেন। অপরদিকে নরেন্দ্র-নাথ দাম্পত্য জীবনে সুখী ছিলেন বলা চলে। স্ত্রীর প্রতি তিনি যে যথেষ্ট মনোযোগী ছিলেন তার পরিচয় মেলে স্ত্রীর প্রতি বিভিন্ন 'প্রণয় পত্রাবলী'[২] থেকে। এই সব পত্রে স্ত্রী শোভনা দেবীকে তিনি বিভিন্ন নামে সম্বোধন করেছেন। নরেন্দ্রনাথের জীবনকে ঘিরে ছিল এক শান্ত স্নিগ্ধ বাতাবরণ। কমলকুমারের জীবনে ছিল দ্বিধা দ্বন্দ্ব, আর তার ফলেই তিনি সমগ্র জীবন একটা অস্থিরতার মধ্যে কাটিয়েছেন। জীবনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত থেকেছেন। নরেন্দ্রনাথের গল্পগুলিতেই এক ধরণের স্নিগ্ধতাকে উপলব্ধি করা যায়, যেটা তার ব্যক্তিগত জীবন থেকে আহরিত ছিল। আবার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীও কোন পেশায় নির্দিষ্ট ভাবে নিযুক্ত থাকতে পারেননি। মূলতঃ সাহিত্য রচনার আকাঙ্ক্ষা থেকেই এ অস্থিরতা তার ভেতরে কাজ করতো। এক অস্থির সময়ের মানুষ তিনজন। উনিশ শতকের স্থিতিশীলতা ভেঙে গেছে, জমির নিস্বত্বভোগ, চাকরির নিশ্চিন্ততা নেই, রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক অস্থিরতা অপরদিকে মধ্যবিত্তকে বিপর্যস্ত করছে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, কমলকুমার এবং নরেন্দ্রনাথ মিত্র - এই তিন শিল্পীই জীবনের কিছু সময় গ্রামে এবং জীবনের শেষ সময়ে শহরে অর্থাৎ কলকাতায় কাটিয়েছেন। তাই তিনজনের গল্পেই গ্রাম এবং শহরের চিত্র পাওয়া যায়। যেমন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'নদী ও নারী' গল্পে গ্রামের চিত্র রয়েছে - "সম্মুখে যতদূর দৃষ্টি যায় নদীর পাড় ধরে মাঠের পর মাঠ। পরিষ্কার স্বচ্ছ শঙ্খপটের মাঝখানদিয়ে আঁকাবাঁকা সরু পথ গেছে যাবার। এখানে ওখানে দুটি একটি নারকেল গাছ।" 'বনের রাজা' গল্পেও এরকম গ্রাম্য চিত্র পাই। আবার শহরের চিত্র রয়েছে বিভিন্ন গল্পে যেমন 'সামনে চামেলি' গল্পে - "পৃথিবী অন্ধকার হয়ে আসে আর তখুনি রাস্তায় বাড়িতে নিওন ফ্লোরেসেন্ট আলো দপদপ জ্বলে ওঠে। যেজন্য হঠাৎ কেমন কিম্ভূতকিমাকার মনে হতে থাকে শহরটা। কিন্তু সেদিনকার রাস্তাটা ভারি সুন্দর ছিল। ধুঁটির মাথায় মাথায় নীলাভ রুপালি আলো, গাছে গাছে অজস্র ফুল তার ওপর গাঢ় নির্জনতা। অথচ দুপাশে সারি সারি বাড়ি। গ্রীল দেওয়া চমৎকার সব ব্যালকনি। কিন্তু কেমন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে থাকার মতন অবস্থা।" [৪] আবার কমলকুমারের 'জল' গল্পে - 'তারা দুজন ভেড়ির উপরে উঠল, হরগজার গাছের ঝোপের মধ্যে নন্দর ছোট জেলে নৌকো খানা বাঁধা ছিল, কাদা ভেঙে তারা উঠল।' [৫] - এই গ্রাম্যচিত্র রয়েছে, কমলকুমারের গল্পে গ্রাম্যচিত্র রাঢ় অঞ্চল অর্থাৎ সাঁওতাল পরগণাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। আবার শহরের চিত্র রয়েছে যেমন 'মল্লিকাবাহার' গল্পে - "অ্যাবহার্স্ট স্ট্রীটের রাস্তা, ছোট পার্কটা অনেক ভীড়, কাঠে কোঁদা ছবি এযত।" [৬] জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ও কমলকুমারের শহরের চিত্রের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী শহরের মধ্যেও প্রকৃতির রঙ, গন্ধের, আস্বাদ পেতে চেয়েছেন। শহরের ইট, কাঠ পাথরের ভীড়ে কুয়োতলার একটুখানি সবুজ নরম ঘাসের স্পর্শ তিনি অনুভব করেছেন। কিন্তু কমলকুমার শহরকে শহরের মতো করেই দেখেছেন। নরেন্দ্রনাথের গল্পে গ্রামের চিত্র এসেছে পূর্ববঙ্গকে নির্ভর করে - "সন্ধ্যার একটু আগে কালু ধলাকর্তার

কাছ থেকে কয়েক ঘণ্টার জন্যে ছুটি নিয়ে গেল। পাশের গায়ে মোল্লাদের বাড়িতে শখের থিয়েটার হবে। পালার নাম 'মীরকাশেম'। গ্রাম গ্রামান্তর থেকে লোক আসবে। ... রাত বাড়তে লাগল, অন্ধকার গাঢ় হতে লাগল, সমস্ত গ্রাম নিঝুম হয়ে এল।" [৭]

আর শহরের ছবি কলকাতাকে ঘিরেই রয়েছে, যেমন 'ফেরিওয়ালা' গল্পে "সদর রাস্তা থেকে ফেরিওয়ালা শহরতলীর সরু গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল। দুই দিকে সারে সারে বাড়ি। ছাদে, রেলিঙে নানা রঙের শাড়ি শুকাচ্ছে, স্তব্ধ দুপুর।" [৮] শৈশবে চিত্রশিল্পের সঙ্গে এই তিন শিল্পীরই পরিচয় ঘটে, কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এবং নরেন্দ্রনাথ উভয়েই সাহিত্যে তার প্রতিফলন ঘটালেও এই শিল্পকে জীবনের অন্য কোন কাজে ব্যবহার করেন নি। কিন্তু কমলকুমার দীর্ঘদিন যাবৎ চিত্রকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন এর প্রভাব পড়েছে, তেমনি অন্যান্য কাজেও এই শিল্পের তিনি চর্চা করে গেছেন। তাঁর গল্পগুলির মধ্যে এই চিত্রময়তা লক্ষ্য করা যায়। সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে 'ঘরে বাইরে'র চলচিত্র রূপায়নের কথা ছিল, এই সময় কমলকুমার অনেক স্কেচ করেছিলেন যেগুলির[৯] একটাও সত্যজিৎ রায়ের অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও দেখতে পাননি। এছাড়াও এক সময় কমল-কুমার উড্‌কাটিং-এর প্রতি মনোযোগী হয়েছিলেন।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ছাত্রাবস্থায় স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি বিশেষ দলের সঙ্গে কিছু দিন প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন, এবং জেলে বন্দী হন। কিন্তু জেল থেকে মুক্তি পাবার পর পরবর্তী জীবনে রাজনীতির সঙ্গে কোন রকম সংযোগ রাখেননি। নরেন্দ্রনাথ জীবনের কোন সময়েই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, এবং এ বিষয়ে ভাবনা চিন্তাও করেননি। কমলকুমার রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন না, কিন্তু দাঙ্গা বিধ্বস্ত কলকাতা এবং মন্বন্তরের যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন তা তিনি জীবনে ভুলতে পারেন নি। কমল-কুমার জীবনের একটা সময়ে অত্যন্ত প্রাচুর্যের মধ্যে জীবন কাটান, আবার জীবনের শেষ প্রান্তে অর্থকষ্টের মধ্যেও কাটিয়েছেন, জীবনের দুটো চরম দিকেই তার অভিজ্ঞতা ছিল গভীর। যেটা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছিল না।

(২)

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, কমলকুমার মজুমদার এবং নরেন্দ্রনাথ মিত্র খুব কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহন করেছিলেন। এই তিনজনেই একটি বিশেষ সময়ের মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত করেছেন। এই সময় হল যুদ্ধ, দাঙ্গা, মন্বন্তর, উদ্বাস্তু সমস্যায় আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। তাই এই তিন শিল্পীর রচনায় যেমন বিষয়গত মিল দেখা যায়। আবার বৈসাদৃশ্যও প্রত্যক্ষ করা যায়। শিল্পীদের রচনার গুনে গল্পগুলি তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এবং নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পে মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত মানুষের সংকটময় জীবনের কথা রয়েছে। যেমন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'তারিনীর বাড়ি বদল' গল্পে দেখা যায় জীবনের শেষ শ্বাসটুকুকেও অবলম্বন করে তারিনী বাঁচতে চেয়েছিল, কিন্তু সেটা সে পারল না। জীবন সংগ্রামে ভাঙাচোরা সামগ্রী নিয়ে সে অসহায় ভাবেই ফুরিয়ে গেল। নরেন্দ্রনাথের 'দশটাকার নোট' বা 'টিকেট' গল্পেও রয়েছে মানুষের দারিদ্রজনিত অসহায়তার কথা। কমলকুমারের গল্পে মধ্যবিত্তের সংকট সেভাবে লক্ষ্য করা যায় না। নরেন্দ্রনাথের গল্পে যুদ্ধ একটা বড় স্থান জুড়ে রয়েছে কিন্তু সরাসরি পটভূমি রচনা করেছে খুব কম গল্পে। যেমন 'পালঙ্ক', 'পুনশ্চ', 'রসাভাস' ইত্যাদি গল্পে এই আবহাওয়াকে উপলব্ধি করা যায়। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে যুদ্ধের প্রসঙ্গ সেভাবে নেই। নরেন্দ্রনাথের 'কাঠগোলাপ' গল্পে যেমন রয়েছে - "আজই না হয় পাকিস্তান, আজই না হয় কপাল পুড়েছে পোড়া দেশের।' অথবা - অনিমা প্রায়ই বলে "ভাগ্যে পাকিস্তানের হাঙ্গামা হ'ল দেশে হিড়িক লাগল গ্রাম ছাড়বার ..." কমলকুমারের 'নিমঅন্নপূর্ণা' এবং 'খেলার প্রতিভা'-এ দুটো গল্পেই যুদ্ধের ফলস্বরূপ যে ভয়াবহ মন্বন্তর ঘটেছিল, তার প্রসঙ্গ রয়েছে। যুদ্ধের ফলে সাধারণ মানুষের জীবনে যে অর্থনৈতিক চাপ পড়েছিল এবং তার ফলে মানুষের চিন্তা ভাবনা, মূল্যবোধের যে পরিবর্তন ঘটছে তা এই তিন শিল্পীর গল্পেই লক্ষ্য করা যায়। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'রাক্ষসী' গল্পে নিমকি নামের

মেয়েটি অর্থউপার্জনের তাগিদে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে রাক্ষসী হয়ে যায়। সেভাবে এই টাকা কীভাবে সে উপার্জন করল পরিবারের কেউ তা জিজ্ঞেস করলনা। 'টাকা পেয়ে খুশি হয়ে বাবা আর পিসি কি তাকে সত্যিকারের একটা রাক্ষসী বানিয়ে দিচ্ছে না। চিন্তা করে নিমকি অসহায় চোখে অন্ধকার শিলিংটা দেখতে লাগল।'[১০] অথবা 'বন্ধুপত্নী' গল্পে সুবিনয়ের দারিদ্রক্লিষ্ট সংসার চালাতে অরুণা সুধাংশুকে রাতের অন্ধকারেপ্রশ্রয় দেয় এবং ধীর ঠান্ডা গলায় বলে 'এ মাসে ওর চিকিৎসাটা হোক, সামনে আবার আপনার টাকা পেলে ওর জামা কাপড় করতে হবে ...'[১১] এই অসহায়তা নরেন্দ্রনাথের গল্পে রয়েছে ভিন্ন ভাবে। যেমন 'চোরাবালি' গল্পে কন্যা রাণুর প্রতি গৌরাঙ্গের অশ্লীল ব্যবহার দেখেও পিতা অনাদি তা মেনে নেয়। নরেন্দ্রনাথ এই সমাজকেই দেখে-ছিলেন সবচেয়ে বেশী।

নরেন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যজীবন যখন শুরু করেছিলেন তখন থেকেই সমাজে নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা বা নারীদের অর্থ উপার্জনের প্রচেষ্টা - এই সমস্যা মধ্যবিত্ত পরিবারে দেখা দিয়েছিল, এর প্রভাব নরেন্দ্রনাথের গল্পে পড়েছে, এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের পুরুষেরা যে নারীর এই প্রচেষ্টাকে খুব সহজে মেনে নেয়নি সে প্রসঙ্গও তার গল্পগুলিতে রয়েছে - যেমন 'সেতার', 'অবতরনিকা' ইত্যাদি গল্পে সংসারের প্রয়োজনেই মেয়েরা নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরীর চেষ্টা করে, কিন্তু পরিবারের পুরুষেরা এটা সহজে মেনে নেয়না। 'অবতরণিকা' গল্পে সুব্রত রূঢ় কণ্ঠে আরতিকে বলে -

> ... আগে জবাব দাও আমার কথার। আমার নিষেধ সত্ত্বেও কেন অফিসে গেলে, আজ ? ... যে অফিসের কাজে রাত আটটা অবধি তোমাকে বাইরে থাকতে হয়, বাড়ির কারো সুবিধা -অসুবিধা অসুখ বিসুখ পর্যন্ত দেখা চলে না, তেমন অফিস তোমাকে কিছুতেই করতে দেব না আমি।[১২]

এই ধরনের সমস্যাকে কেন্দ্র করে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বা কমলকুমার তাদের গল্প রচনা করেন নি - যদিও এই সমস্যাটি তাদের চারপাশে বাস করা মানুষদেরই একটি প্রধান সমস্যা হয়ে তখন দেখা দিয়েছিল। এছাড়াও সুমনোনীত পাত্রকে বিবাহ করা বা বিধবা বিবাহ করা, যেভাবে নরেন্দ্রনাথের গল্পের অন্যতম বিষয় হয়ে উঠেছে, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বা কমলকুমারের গল্পে সেটা দেখা যায় না। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'খাদক' গল্পে স্ত্রীর চাকরী করার বাসনা কোনভাবেই প্রশ্রয় না দেবার সামান্য উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু গল্পে এ বিষয়টিই প্রধান হয়ে ওঠে নি। অর্থাৎ নরেন্দ্র নাথের গল্পে সমাজ প্রত্যক্ষভাবে প্রতিবিম্বিত। অন্য দুজনের কাছে শিল্পই প্রধান, সমাজ না এলে নয়, তাই ব্যবহৃত হয়েছে।

নরেন্দ্রনাথের গল্পের একটি বৃহৎ অংশ অধিকার করে আছে নরনারীর প্রেম ভালোবাসা। কমলকুমারের গল্পে নির্মল প্রেমের কাহিনী নেই বললেই চলে। প্রেম সেখানে ভিন্ন প্রয়োজনে ভিন্ন রূপে এসেছে। নরেন্দ্রনাথের নর-নারীর প্রেম যেহেতু মধ্যবিত্ত জীবনকে কেন্দ্র করে, তাই প্রেমের ক্ষেত্রেও মধ্যবিত্ত মানসিকতা অর্থাৎ দ্বিধা, সংশয়, ভয় ইত্যাদি স্বাভাবিক ভাবেই এসেছে। আর জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী প্রেমের চেয়ে প্রেমহীনতার গল্পই অধিক রচনা করেছেন। তার গল্পে নর-নারীর প্রেম সর্বদাই যৌন আকাঙ্ক্ষাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে যার পরিণামও হয়েছে ভয়ংকর যেমন 'পতঙ্গ' গল্পে পলাশ এই শারীরিক প্রেমের তীব্র আকর্ষণে অবশেষে হত্যাকারী হয়ে ওঠে। অথবা 'সমুদ্র' গল্পেও স্বামী স্ত্রীর ভালবাসায় হত্যার আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে। কমলকুমারের 'গোলাপসুন্দরী' গল্পে অবশ্য বিলাস মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে ভালবাসাকে অবলম্বন করে কিন্তু কমলকুমারের এ গল্পে ভালোবাসার চেয়েও মৃত্যু সম্পর্কে দার্শনিক ভাবনাই বড় হয়ে উঠেছে। তাঁর প্রথম গল্প 'লালজুতো'তে কিশোর প্রেমের প্রসঙ্গ থাকলেও বয়ঃসন্ধিক্ষণে যে বিচিত্র মানসিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাকে দেখাতে চেয়েছেন।

এই তিন গল্পকারের গল্পে যৌনচেতনা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এসেছে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে যৌন চেতনা নিছক যৌনতা হিসেবে নেই, নর-নারীর পারস্পরিক সম্পর্কের মূল্যায়নের ভিত্তিতে তাকে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন যেমন গিরগিটি' গল্পে মায়া আর বৃদ্ধভুবনের মধ্যে যে আকর্ষণ অথবা 'মঙ্গলগ্রহ' গল্পে বৃদ্ধ কুলদারঞ্জনের সঙ্গে প্রতিবেশিনীর সম্পর্ক। কমলকুমারের গল্পে এই যৌনতা এসেছে অভিনব ভাবে। তাঁর বিখ্যাত গল্প 'মল্লিকাবাহার' - এ দেখা যায় জীবনে প্রত্যাখ্যাত দুই নারী পরস্পরের প্রতি ব্যবহার করে নারী পুরুষের মতো, এখানে তিনি স্পষ্টত'ই নারীতে নারীতে সমকামীতার ছবি এঁকেছেন - 'না', দৃঢ়কণ্ঠে শোভনা বললে। বোধ হয় মিথ্যা। হেসে বললে, 'আমি তোমার স্বামী তুমি — '

'বউ'

শুনে শোভনা আবেগে চুম্বন করলে। শোভনার মুখসৃত লালা মল্লিকার গালে লাগল।"[১৩]

- এ ছবি শুধু অভিনবই নয় দুঃসাহসিক পদক্ষেপও বলা যায়। পুরুষে পুরুষে সমকামিতার কিছুটা আভাস রয়েছে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'সোনার চাঁদ' গল্পে। কমলকুমারের পূর্বে এভাবে বাংলা সাহিত্যে যৌন বিষয়ে কেউ বলেন নি। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের গল্পে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যৌনতা বিষাদে আবৃত হয়ে গেছে। তাঁর রচনায় যৌনতা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত কিন্তু কখনোই তা বাঁধ ভাঙা পরিণতি লাভ করেনি। নরেন্দ্রনাথের মধ্যবিত্ত রুচিবোধ ও সীমাবদ্ধতা এই সব বিষয়কে চিন্তার বৃত্তে আনতেই দেয়নি। নরেন্দ্রনাথের কিছু গল্পের বিষয় হয়েছে কিশোরী বা তরুণীর সঙ্গে অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধ পুরুষের আকর্ষণের কথা যেমন [illegible] 'ছাত্রী' ইত্যাদি। কিন্তু কখনোই নরেন্দ্রনাথ এই ধরনের সম্পর্ককে সমর্থন করেন নি। রচনাভঙ্গি থেকেই তাঁর অসমর্থন স্পষ্ট হয়ে যায়। কমল কুমারের গল্পে অবশ্য এ ধরনের প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না। এই ধরনের আকর্ষনের উল্লেখ রয়েছে আবার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'মঙ্গলগ্রহ' বা 'গিরগিটি' ইত্যাদি গল্পে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ও কমলকুমারের রচনায় নারী-পুরুষের

সম্পর্কের মধ্যে জৈবিকতার দিকটি স্পষ্ট। উচিত-অনুচিতের কথা নয়, কী হয় তার কথা-ই এঁরা বলতে চেয়েছেন। নরেন্দ্রনাথের গল্পে রূপ সচেতনতা ও যৌন আকাঙ্ক্ষার ছাপ আছে, কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ও কমলকুমারের তুলনায় তাঁর লেখায় সেই সম্পর্কের মানসিকতার দিকটি অনেক বেশী। শুধু মাত্র শারিরীকতায় তিনি কোন সম্পর্ককে আবদ্ধ রাখেন না। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর রচনায় এবং কমলকুমারের রচনায় নর-নারীর যে সম্পর্ক তা আমাদের আঘাত করে। এঁদের লেখায় সমাজের অবক্ষয়ের রূঢ়তা স্পষ্ট, কিন্তু নরেন্দ্রনাথের গল্পে সমাজ চেতনার দিকটি আরো সম্পূর্ণ ও স্বাভাবিক। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে যৌনতা অনেক ক্ষেত্রেই প্রকৃতিকে নির্ভর করে বা প্রকৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে এসেছে।

নরেন্দ্রনাথের গল্পে মুসলমান সমাজ, পরিবার অন্যতম প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে। এই সমাজের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন প্রকৃতির নর-নারী তাদের সুখ-দুঃখের কথা নিয়ে উঠে এসেছে। যেমন 'চাঁদমিঞা', 'রস', 'দ্বিরাগমন' বা 'পালঙ্ক' ইত্যাদি গল্পে এই সমাজকে এমনভাবে অঙ্কন করেছেন যার দ্বারা বোঝা যায় নরেন্দ্রনাথ এই সমাজকে খুব কাছ থেকেই দেখেছিলেন। তবে 'রস' গল্পে বিষয়ের প্রসঙ্গে সে টাকার উল্লেখ তিনি করেছেন, সে সম্পর্কে লেখক আনিসুজ্জামান বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, তিনি বলেছেন -

> ... বাংলা দেশে কোথাও যে বিয়ে করতে গিয়ে মুসলমান পুরুষ টাকা দেয় মেয়ের বাপকে তা আমার জানা ছিলনা, এখনও নেই। [১৪]

কিন্তু কবিতাচন্দের কথাকে সমর্থন করে বলা যায় -

> অভিযোগটি মেনে নিলে সমগ্র গল্পটি দাঁড়ায় একটি অবান্তর পটভূমির উপর। কারণ বিয়ে উপলক্ষে টাকা রোজগারের উপায়েই এই গল্পের মূল সমস্যা লুকিয়ে আছে। [১৫]

দেশবিভাগকে কেন্দ্র করে যে সাম্প্রদায়িক সমস্যা তথা হিন্দুদের ওপর মুসলমানদের দ্বারা আক্রমন এসেছিল তার ফলে লেখকের মনে কখনোই ঘৃনা বা বিদ্বেষ জন্ম নেয়নি। কারণ শৈশব থেকেই এই সমাজের সঙ্গে তিনি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন। কমলকুমারের গল্পেও মুসলমান চরিত্র কিছু দেখা যায়, এ বিষয়ে তিনি অসাম্প্রদায়িক মানসিকতারই ছিলেন। যেমন 'জল' বা 'তেইশ' গল্পে ফজল বা আলম ইত্যাদি চরিত্র রয়েছে। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে মুসলমান সমাজ বা মানুষ একেবারে নেই বললেই চলে। অথচ পূর্ববঙ্গে তিনি জীবনের অনেকটা সময়-ই কাটিয়েছেন। কমলকুমারের গল্পে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পাওয়া যায়, যা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে নেই।

নরেন্দ্রনাথের গল্পে কলকাতার আসেপাশে গজিয়ে ওঠা কলোনী, এবং তাদের বাসিন্দারা চরিত্র হয়ে উঠেছে। যেমন 'কাঠগোলাপ', 'ফেরিওয়ালা' - ইত্যাদি গল্পে এই সব মানুষেরা রয়েছে। এই কলোনী গুলো কলকাতায় গড়ে উঠেছিল বিশেষ একটি রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে। অর্থাৎ দেশভাগ হয়ে যাবার পর দলে দলে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের দ্বারাই এই সব কলোনী গড়ে উঠেছিল। এই কলোনী জীবনেই গ্রামের গৃহস্থ ঘরের বধূ শহরে হয়ে উঠেছে কাজের ঝি (দ্বিচারিনী)। গ্রামের এক সময়কার বিদ্যালয়ের হেডমাস্টার হয়ে উঠেছেন অফিসের পিওন (হেডমাস্টার)। শুধুমাত্র কলোনীর জীবনের চিত্রই নয়, কীভাবে উদ্বাস্তু হয়ে আসা মানুষ জীবনধারনের জন্য নিজেকে পরিবর্তিত করে নিতে বাধ্য হচ্ছে, সে চিত্র নরেন্দ্রনাথ নিপুনভাবে এঁকেছেন। এই কলোনী জীবনযাত্রা, উদ্বাস্তু হয়ে আসা মানুষের কথা খুব পরিস্কার ভাবে চিত্রিত হয়েছে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'বারোঘর এক উঠান' উপন্যাসে। এছাড়া 'তারিনীর বাড়ি বদল', 'বুটকি ছুটকি' ইত্যাদি গল্পে রয়েছে। কমলকুমারের গল্পে এই উদ্বাস্তু হয়ে আসা মানুষের কলোনী জীবন সেভাবে দেখা যায় না। অর্থাৎ এদের অনেক গল্পেই দেখা যায় মানুষের মূল্যবোধ বদলে যাচ্ছে। ঐতিহ্যগত ধারনা ভেঙে পরছে।

কমলকুমারের কিছু গল্পে সমাজের কৃষি নির্ভর মানুষ, তাদের বঞ্চিত হবার কাহিনী পাওয়া যায়। যেমন 'তেইশ' গল্পে আলম ছিল এক প্রান্তিক চাষী, কিন্তু জমিদারের অত্যাচারে সে হয়ে পড়ে ভূমিহীন এবং ভিক্ষাবৃত্তি সে গ্রহণ করে জীবনধারণের জন্য। জমিদারদের অত্যাচারের ছবি রয়েছে তাঁর 'কয়েদ' খানা গল্পে। এই দরিদ্রক্লিষ্ট সমাজের অন্ত্যেবাসী মানুষদের মধ্যে কিছু জন 'বাবু' বা জমিদার শ্রেণীর ভালোমানুষীর আড়ালে যে প্রতারনা রয়েছে তা ধরতে পারে না। তারা তাদের এই দারিদ্র্যকে নিজেদের ভাগ্য বলে মেনে নেয়। 'কেননা খোদা সবাইয়ের উপর দয়া রাখেন'[১৬] কিন্তু আলম বা শাহাদাজের মতো মানুষেরা জমিদারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠতে চায়, তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। নরেন্দ্রনাথের গল্পে কৃষক আন্দোলন বা এ ধরনের কৃষক শ্রেণীর সঙ্গে জমিদার শ্রেণীর অত্যাচার বা বঞ্চনার কথা পাওয়া যায় না। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পেও কৃষক শ্রেণীর এই আন্দোলন মুখী হয়ে ওঠার প্রসঙ্গ নেই। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'চাঁদমিঞা' গল্পে অবশ্য জমিদারী অত্যাচারের কাহিনী রয়েছে, কিন্তু প্রেম-ই সেখানে প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে।

কমলকুমার তার গল্পে যুদ্ধোত্তরকালীন সমাজে যে ধনী দরিদ্রের বিভেদ প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে সেটা উল্লেখ করেছেন 'লুপ্তপূজা বিধি' গল্পে। এখানে একটি প্রদর্শনীকে কেন্দ্র করে কমলকুমার দেখাতে চেয়েছে গোটা ভারতবর্ষ কীভাবে দারিদ্র্য ও প্রাচুর্যে বিভক্ত। সমাজে এই শ্রেণী বিভাগের চিত্র পাওয়া যায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'হিমির সাইকেল শেখা' বা 'বাদামতলার প্রতিভা' গল্পে। প্রথম গল্পটিতে দেখা যায় -

> "জগদীশ হাসে। - বস্তির পাশে আমার তেতলা বিল্ডিং
> যানিয়েছে ভাল।[১৭]

আর 'বাদাম তলার প্রতিভা' গল্পে কিশোর বাবলা বলে -

... ওই সি আই টি এসে তো মাঝেরকটা বাড়ি ভেঙে
দিল - আর তাই ফুটুনি ঝাড়া হচ্ছে এটা বস্তিপাড়া ওটা
আরিস্টকসী পাড়া - কেমন ? [১৮]

নরেন্দ্রনাথের গল্পে এ ধরনের স্পষ্ট শ্রেণী বিভাগের চিত্র দেখা যায় না। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে আবার দেখি পরিবর্তিত সমাজে - মানুষ কীভাবে দূষিত হচ্ছে। এই চিত্র রয়েছে 'ওয়াং ও খেলা ঘরে আমরা' গল্পে। এখানে ওয়াং-এর প্রেতাত্মা লেখককে জানিয়ে দেয় -

আমি রক্ত চাই না। ... পৃথিবীর সব রক্ত খারাপ হয়ে গেছে।
... দিস ইস এ উইকেড্ ওয়ার্ল্ড অল ম্যান করাপটেড্। [১৯]

এই করপসন বা দুর্নিতি গ্রস্থ মানুষের কথাও নরেন্দ্রনাথের গল্পের বিষয় হয়ে ওঠেনি, বরং এই দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজের-ই মানুষের প্রেম ভালবাসা, পাওয়া না পাওয়ার কাহিনীই প্রধান হয়ে উঠেছে। অবশ্যিত এই সমাজে কলুষিত রাজনৈতিক আবহাওয়ায় শিশুরাও যে একটা সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে, সেটা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের অন্যতম বিষয় হয়ে উঠেছে। যেমন 'বিকেলের খেলা' গল্পে রাজনীতি শিশুদের কী ভয়ানক পরিণতিতে নিয়ে গেছে, যেখানে দেখতে পাই দুটি শিশু নিজেকে পরস্পরকে আঘাত করে মৃত্যুর মুখে চলে পড়েছে 'বাবলু পার্টি' আর 'পিন্টু পার্টি' তকমা জামায় এঁটে। শিশুরা আরো ভয়ংকর পরিস্থিতিতে রয়েছে 'ইস্টিকুটুম' গল্পে, সেখানে গনেশ তমকের ডাককেও তত ভয় পায় না যত ভয় পায় যে পরিস্থিতিতে সে রয়েছে, তাকে। কমলকুমারের গল্পেও শিশুরা অসহায় অবস্থায় রয়েছে, এ চিত্র পাওয়া যায় 'স্বাতি নক্ষত্রের জল' গল্পে। অভিভাবকদের পদমর্যাদা আর উচ্চাকাঙ্খা শিশুমনকে কীভাবে নষ্ট করে দিচ্ছে, সে প্রসঙ্গ এ গল্পে পাই। কিন্তু শিশুদের এই অসহায়তার কথা নরেন্দ্রনাথের গল্পে সেভাবে পাওয়া যায় না।

কমলকুমারের গল্পে পরিবর্তিত সমাজে মানুষ ক্রমশ পরিবর্তিত হতে হতে 'র' বাবু 'মিঃ' অথবা 'মিসেস' ইত্যাদিতে চিহ্নিত হয়ে পড়ছে, অর্থাৎ আত্মপরিচয় (Identity) মানুষের হারিয়ে যাচ্ছে। এই আত্মপরিচয় হারিয়ে যাবার কথা নরেন্দ্রনাথের গল্পে ও রয়েছে। কিন্তু কমলকুমারের 'দ্বাদশমৃত্তিকা' বা 'স্বাতিনক্ষত্রের জল' গল্পে যারা আত্ম পরিচয় হারাচ্ছে তারা উচ্চবিত্ত মানুষ, সমাজের উচ্চকোটিতে তাদের বসবাস। আর নরেন্দ্রনাথের গল্পের মানুষেরা একটি বিশেষ পরিস্থিতিকে 'সমাজের পরিবর্তনে, বেঁচে থাকার সংগ্রামে আত্মপরিচয় হারিয়ে গ্রামের বধূ থেকে 'ঝি'তে অথবা 'হেডমাস্টার' পিওনে পরিবর্তিত হচ্ছে। মানুষের এই আত্মপরিচয় হারানোর প্রসঙ্গ রয়েছে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'মুখোস' গল্পে। সেখানে দেখি- মানুষ আর মানুষের চেহারায় থাকছে না, তারা - পশু, কীট, পতঙ্গের মুখের আড়ালে পরিবর্তিত হচ্ছে। কমলকুমার এই উচ্চবিত্তের সমাজে নিজে এক সময় ঘনিষ্ট ভাবে জড়িত ছিলেন। তাই খুব সহজেই এই পরিবর্তন তাকে ভাবিয়েছিল। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ নিজে মধ্যবিত্ত জীবনের মানুষ, এবং এ জীবনকেই তিনি ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছিলেন তাই তার গল্পে স্থান করে নিয়েছে উদ্বাস্তু হয়ে আসা মানুষেরা। যারা প্রয়োজনের তাগিদে নিজেদের পরিবর্তন করে নিচ্ছে। তবে মানুষের আত্ম পরিচয় হারাবার চিত্র অন্যভাবে রয়েছে কমলকুমারের 'বাগান কেয়ারি' গল্পে। সেখানে একজন শ্রমিক যে বেঁচে থেকেও নামগোত্রহীন হয়ে শ্রমজীবী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়, কিন্তু মৃত্যুর পর তার সেটুকু পরিচয় হারিয়েও সে পরিচিত হয় 'ক্রিমিন্যাল' হিসেবে। জীবনের এমন অপচয়ের ছবি কমলকুমার ছাড়া খুব কম শিল্পই অঙ্কন করেছেন।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কিছু গল্প প্রকৃতিকে নির্ভর করেই দাঁড়িয়ে আছে - যেমন - 'বনের রাজা', 'গাছ', 'সামনে চামেলী', 'আমকাঠালের ছুটি' অথবা 'বৃষ্টির পরে' ইত্যাদি। 'বনের রাজা' গল্পে বৃদ্ধ সারদা যখন পুকুর থেকে স্নান করে

ওঠে তখন নাবালক মতির কাছে মনে হয় - 'দাদুর গায়ের সাদা ধূসর লোমগুলি যেন গাছের শ্যাওলা।'[২০] আর তার শরীর থেকে যে গন্ধ আসছিল তা 'মাছের গন্ধ না, আমের গন্ধ না, শীরের গন্ধনা, জাম-জামরুলের গন্ধনা। জলের গন্ধ ? শ্যাওলার গন্ধ ? তা-ও না, মতি বুঝল কোমল মিষ্টি ঠান্ডা মৃদু শাপলা ফুলের গন্ধ এটা।'[২১] এ গল্পের শুরুতেই সারদা বলে 'গাছ আমার সঙ্গে কথা বলে' অথবা নাতির প্রশ্নের উত্তরে সে বলে 'আছে বৈ কি। জিব আছে, কান আছে। নাক আছে, চোখ আছে। ...' আমাদের মতো ওরাও সব কিছু দেখতে পায়।'[২২] 'গাছ' গল্পে গাছেরই অনুভূতির কথা প্রাধান্য পেয়েছে। গাছ-ই এখানে প্রধান চরিত্র। যেমন - 'গাছ শুনে দুঃখ পেল, আবার মনে মনে হাসল, যেন পুবের জানালার মানুষটিকে তার ডেকে বলতে ইচ্ছে হল ...'[২৩] অথবা 'গাছের মনে গাছ দাড়িয়ে রইল।'[২৪] নরেন্দ্রনাথের গল্পে, প্রকৃতি কাহিনীর পশ্চাদপট হিসেবেই এসেছে। 'প্রকৃতিই গল্পের প্রধান চরিত্র হয়ে ওঠেনি। কমলকুমারের গল্পেও প্রকৃতি কাহিনীর পশ্চাদপট হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে, চরিত্র হয়ে ওঠে নি।

নরেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে প্রাত্যহিক জীবনের খুব তুচ্ছ বস্তু গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে যেমন 'শাল', 'টিকেট', 'এ পো দুধ', 'জামা' 'পালঙক, 'পদক', 'ক্যালেন্ডার' 'বেহালা', 'সিগারেট', 'জমি', 'দশটাকার নোট' ইত্যাদি। এই তুচ্ছ সামান্য বস্তু গুলোই মানুষের জীবনের কত হাসি কান্না মিশ্রিত ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকতে পারে, তা নরেন্দ্রনাথ তার গল্পে দেখিয়েছেন। যেমন 'শাল' গল্পে বিথীকা তার মৃত স্বামীর স্মৃতি হিসাবে যে শালকে অতি অবস্থায় রেখেছিল, সে শালটিকে যখন অনিমেষের সিগেরেটের স্ফুলিঙ্গে ফুটো হয়ে যায় তখন বিথীকা এই সামান্য ঘটনাকে উপেক্ষা করতে পারে না। 'শত ছিদ্র স্মৃতির ভান্ডারে তার এখনো একি স্বর্ণরেণু, সঞ্চয়ের সাধ।'[২৫] সামান্য একটি শাল তাদের মধ্যে স্মৃতি হয়ে কাঁটার মতো বিঁধে আছে, কেউ তাকে অতিক্রম করতে পারছে না।

'পালঙ্ক' গল্পে দুটি অসমশ্রেণীর মানুষের মধ্যে সংঘাত নয়, বরং হৃদয়ে মেল-বন্ধন লক্ষ্য করা যায়। আবার 'জামা' গল্পে রয়েছে ধনী দরিদ্রের শ্রেণী বিভাগের স্পষ্ট চিত্র। একটি 'জামা'কে কেন্দ্র করে একটি দরিদ্র মানুষের মনের অভিমানই প্রধান হয়ে উঠেছে। 'বেহালা' গল্পে এই নিষ্প্রাণ যন্ত্রটি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের গভীরতা সৃষ্টি করতে সাহায্য করে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, কমলকুমার, নরেন্দ্রনাথের বিভিন্ন গল্পে যুদ্ধোত্তর কালীন সময়ে যে কালো বাজারি শুরু হয়েছিল সেই প্রসঙ্গ এসেছে যেমন জ্যোতিরিন্দ্রনন্দীর 'মাছ' গল্পে তারিনী তার প্রতিবেশী বিত্তবান পলাশবাবুর অর্থ উপার্জন সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে বলে -

> আমার তো মনে হয় কেবল ওকালতি না, পলাশ নন্দী সিমেন্ট হোক চাল হোক - কিছু একটার ব্ল্যাক মার্কেটিং চালাচ্ছে - তাই না এমন গাড়ি বাড়ির জৌলুশ। [২৬]

আবার একই ভাবে নরেন্দ্রনাথের 'টিকিট' গল্পে শীতাংশু ট্রামে টিকিট না কেটে ট্রামের কন্ডাকটারকে ফাঁকি দিয়ে নেমে পড়ায় এক ধরনের উল্লাস বোধ করে। তার এই উল্লাসকে লেখক তুলনা করেছেন - যে 'কালোবাজারে পাঁচ লক্ষ টাকা রোজগার করেও কোন লাখপতি বোধ হয় এমন উন্মাদনার স্বাদ পায় না।'[২৭] কমলকুমারের 'দ্বাদশ মৃত্তিকা' গল্পেও দেখা যায় লেখক বলছেন -

> এই খানকার উচ্চকিত শ্বাসেতে সমস্ত কফটিতে বৈকল্য প্রভবিয়াছে, পাখাটির গতিশীলতা হ্রাস হইতে আছে, ব্ল্যাক আউট ঠোঙা দেওয়া আলো কম - এই দল যে কেমনভাবে সময় অতিবাহিত করিবে তাহা ঠাহর বহির্গত সম্ভবিল। [২৮]

(৩)

রবীন্দ্রনাথের হাতেই যে 'ছোটগল্প' একটি শ্রেষ্ঠ শিল্প হয়ে উঠেছিল, তার অন্যতম কারণ হল তার অপূর্ব ভাষা প্রয়োগের দক্ষতা। 'রবীন্দ্রনাথের আগে বাংলা ভাষায় শুধু যে ছোট গল্পের আদর্শ ছিল না, তাই নয়, গল্পের ভাষাও তাকে গড়তে হয়েছে।[২৯] এ বিষয়ে তিনি বলেছিলেন -

> গদ্যের ভাষা গড়তে হয়েছে আমার গল্প প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে। মোপাসাঁর মতো যে সব বিদেশী লেখকের কথা তোমরা প্রায়ই বল, তাঁরা তৈরি ভাষা পেয়েছিলেন। লিখতে লিখতে ভাষা গড়তে হলে তাঁদের কি দশা হত জানি নে।[৩০]

কাজেই গল্প রচনার ক্ষেত্রে ভাষার যে একটা বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে তাকে স্বীকার করতে হবে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তার গ্রাম এবং শহর কেন্দ্রীক উভয়ক্ষেত্রের গল্পেই একই রকম ভাষা ব্যবহার করেছেন। এক সাক্ষাৎকারে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বলেছিলেন -

> ... আসলে আমি কিছু সুন্দর শব্দ নিয়ে, কথা নিয়ে গল্প তৈরি করব - ... গল্প যখন দাঁড়িয়ে যায় তখন শব্দগুলিই তাকে তৈরি করে।[৩১]

এই সাক্ষাৎকারেই তিনি বলেছেন -

> ... এই যে শিল্পসম্মত, বুদ্ধিগ্রাহ্য শব্দ চয়ন করে জীবনানন্দ কবিতা রচনা করতেন, আমারও ইচ্ছা হত ঠিক ঐরকম শব্দ সাজিয়ে একটি করে গল্প লিখি।[৩২]

এর থেকে বোঝাই যায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। সুমিতা চক্রবর্তী, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ভাষা ব্যবহার প্রসঙ্গে যেকথা বলেছেন তাকে মেনে নিয়ে বলা যায় - তার 'ভাষা অন্যের পক্ষে অননুকরণীয়। প্রতিটি শব্দের সুচিন্তিত

নির্বাচন, সব ধরনের দেশি ও বিদেশি শব্দ, শব্দের অভিনব বিন্যাস ...।" [৩৩]
- এ সবই তার গল্প ভাষার উদাহরণ থেকে অনুধাবন করা সম্ভব - বিশেষণে ভূষিত করে তার সৌন্দর্য বোঝা যাবে না।' তার গল্পে উপমা, শ্লেষ ইত্যাদির অপূর্ব প্রয়োগ দেখা যায়। উপমা ব্যবহারে তিনি অনেকটাই কবি জীবনানন্দের অনুসারী। যেমন 'চমৎকার চওড়া খাট জুড়ে এমন ফুরফুরে-ঠান্ডা হাওয়ায় মশারিটা মরা হাতির পেটের মতন ফুলে উঠছে, অবিশ্বাস্য রকম মিষ্টি হেনায় গন্ধ সেখানে'(আরশোলা)। এখানে সম্পর্কের পচনকে 'মরাহাতির পেটের'-এর সঙ্গে এক করে দেখা হয়েছে। আবার কিছু গল্পে বাক্যের টুকরো টুকরো গড়নে, কয়েকটি বাক্যগুচ্ছের অনবরত আবর্তনে শ্লেষ ঘনীভূত হয়েছে - যেমন 'বিকেলের খেলা' গল্পে 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' বা 'হিমির সাইকেল শেখা' গল্পে 'গরিবি হটাও গরিবি হঠাও' - ইত্যাদি। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী উপমা, চিত্রকল্পে বা বর্ণনায় পশু, কীট, পাখি, সরীসৃপ, মাছের ব্যবহার করেছেন। যেমন 'ইন্টিকুটুম' গল্পে বর্ণনার ক্ষেত্রে এদের ব্যবহার - 'পাখিটা আর একবার মিঠে বুলিটা শুনিয়ে দিয়ে আচমকা উড়ে গেল। ... ফড়িং প্রজাপতি নীরবে নড়াচড়া করে। - পাকা নিমফলের গন্ধে এক ঝাঁক বোলতা কোথা থেকে ছুটে এসে ... বোঁবোঁ করে ঘুরছে নাচছে।" [৩৪] অথবা উপমা ব্যবহারের ক্ষেত্রে পাখির তুলনা রয়েছে - 'এবার গণেশ ঘাড় সোজা করে বসল। পাখির খাঁচার মত শীর্ণ পাঁজরের ভিতর হৃদ্‌পিন্ড ধড়াস করে উঠছে।'[৩৫] অথবা 'মঙ্গল' গ্রহ গল্পে 'ঘন চকচকে ছোপ দেওয়া শাড়ি পরনে মনে হল মঙ্গলগ্রহের লাল অরণ্যে নিঃশব্দচারিনী কোনো বাঘিনী।'[৩৬] নরেন্দ্র নাথের গল্পে উপমার ক্ষেত্রে এধরণে পশু পাখি, কীট, পতঙ্গের ব্যবহার করেন নি। নরেন্দ্রনাথ তার গল্পগুলিতে ভাষার ক্ষেত্রে বিবৃতি মূলক ও বিশ্লেষণীমূলক পদ্ধতির মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। তার ভাষার বড় বৈশিষ্ট্যই হলো, তা অত্যন্ত সরল এবং নিরাভরণ। এই সরল, নিরভিরণ বাক্যের মধ্যে দিয়েই গল্পের মূল

অনুভূতিকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করতেন। বাক্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে তার পরিমিতিবোধ লক্ষ্যনীয়। তার গল্পের অনেক ক্ষেত্রেই এমন কিছু বাক্যের ব্যবহার দেখা যায় যা পৃথক-ভাবে অত্যন্ত সাধারণ কিন্তু সেই বাক্যই গল্পের সূক্ষ্ম অনুভূতি প্রকাশে অসাধারণত্ব লাভ করেছে। যেমন 'রস' গল্পের শেষে মোতালেফের জন্য যাজু খাতুনের মনের কোনে কোথায় যেন একটু মমতা রয়ে গেছে তারই আভাস দেয় মোতালেফের উক্তি- 'না মেক্রাভাই নেবে নাই'। এ ধরনের বাক্য প্রয়োগ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পেও দেখা যায় যেমন 'বাদাম তলার প্রতিভা' গল্পে বাবলার বন্ধুরা তার কান্নারই অংশীদার হয়ে চুল টেনে তাকে প্রশ্ন করে অরুণকে কামড়ানোর প্রসঙ্গে - 'মিষ্টি লাগল রক্তটা'? - এই সব হত দরিদ্র-শিশুদের মনের মধ্যে চেপে রাখা অভিমান এই একটি বাক্যেই পরিস্ফুট হয়। কমলকুমারের কিছু গল্পেও খুব সাধারণ বাক্য অসাধারণত্ব লাভ করেছে যেমন 'তাহাদের কথা' গল্পের সমাপ্তিতে শিবনাথ লৌহ শৃঙ্খলের শৈত্য নিজ গালে অনুভব করার সময় বলে 'খুব ঠান্ডারে খুব ঠান্ডা'। এই সাধারণ একটি বাক্যই - স্বাধীনতা-উত্তর কালে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্পর্কে মানুষের মনের ঠান্ডা অনুভবকেই বুঝিয়ে দেয়।

নরেন্দ্রনাথের গল্পের ভাষায় কাব্যধর্ম উপলব্ধি করা যায় যেমন 'রস' গল্পে - 'আমের গাছ বোলে ভরে উঠল গাব গাছের ডালে ডালে গজাল তামাটে রঙের কচি কচি নতুন পাতা। শীতের পরে এল বসন্ত, যাজু খাতুনের পরে এল ফুলবানু, ফুলের মতই মুখ। ফলের গন্ধ তার নিশ্বাসে।'[৩৭] জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের ভাষাতেও এই কাব্যধর্ম রয়েছে, যা স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত। যেমন 'গাছ' গল্পে -'বর্ষায় পাতাগুলি বড় হয় পুষ্ট হয়, শরতে পাতাগুলি ভারি হয় মোটা হয়, সবুজ রং অতিরিক্ত-সবুজ হয়ে কালোর কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ায়।'[৩৮] অথবা

'গিরগিটি' গল্পে 'খোঁপায় মালা জড়িয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে যায়া বাইরের উঠান দেখে। জলে জ্যোৎস্নায় গাছের পাতাগুলো চিক চিক করছে। হাওয়ায় নড়ছে। পেয়ারা পাতা থেকে টুপটাপ রুপালি জল ঝরছে।" [৩১] কমলকুমারের গল্পে উপমা ব্যবহার হয়েছে আরো আশ্চর্যভাবে -'ফৌজ-ই-বন্দুক' গল্পে 'মেয়েটির নিশ্বাস আসে ও যায়, সকালে নদীর উপরে হাওয়া যেমন'। - আবার ভাষায় কাব্যময়তা রয়েছে যেমন 'তাহাদের কথা' গল্পে - 'ভোর হয়, গাছের পাতা অযথা কালো, পাখীর উড়ায় শূন্যতা উদ্‌ব্যস্ত।" অথবা এ গল্পেই দেখা যায় 'একটি নীল স্পন্দন। মনের কিছু ভাগ, বনের কিছু ভাগ দিয়ে গড়া নীলকণ্ঠ পাখি।'

নরেন্দ্রনাথ ও কমলকুমারের অনেক গল্পে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার দেখা যায়। যেটা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে দেখা যায় না। কমলকুমারের 'তাহাদের কথা' গল্পে বিপিন গুপ্ত বলে 'কে বটে জ্যোতি লয় ?' জ্যোতির প্যান্ট প্রসঙ্গে উত্তর - 'জানি না, একজনা দিইছে বটে।' - এ ভাষা পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলের মানুষের ভাষা। এ অঞ্চলের একেবারে নিম্নবর্গে বাস করা মানুষেরা যে ভাষায় কথা বলে কমলকুমার - সংলাপের ক্ষেত্রে সে ভাষাকেই ব্যবহার করেছেন তাদের চরিত্রের বাস্তবায়নে যেমন 'মতিলাল পাদরী' গল্পে - 'যদু বলে '... ওগো বলি, শোন মাগী বড় সুবিধের লয়, লাৎসোঁয়ারি' অথবা 'কয়েদখানা' গল্পে শাজাদ বেয়াড়া-তাড়ানো গলায় হেহে করে বলে উঠল, 'খায় শালা পাখ্‌থুরে হারামী শালা 'হুজুর হুজুর' বলি হুজুরের বুকজোড়া ব্যাঙ্গলী রাঢ়।

নরেন্দ্রনাথের গল্পে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার হয়েছে কিন্তু সেখানেও তার মধ্যবিত্ত রুচিশীল মন কাজ করেছে যেমন 'রস' গল্পে যাদু খাতুন মোতালেফের কাছ

থেকে বিবাহের প্রস্তাবে আশ্চর্য হয়ে বলে -

রঙ্গ তামাসার আর মানুষ পাইলা না তুমি ! ক্যান্ কাঁচা
বয়সের মাইয়া পোলার কি অভাব হইছে নাকি দেশে যে
তাগো থুইয়া তুমি আসবা আমার দুয়ারে।

- এ ভাষা পূর্ববঙ্গের, হয়তো বা ফরিদপুরেরই লেখকের অতি পরিচিত ভাষা। লক্ষ্য করার বিষয় নরেন্দ্রনাথ নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত সংযত থেকেছেন। এমন প্রসঙ্গ বা এমন ভাষা তিনি কখনোই গল্পে ব্যবহার করতেন না যা তার রুচিকে বাধা দিত। যদিও একজন সাহিত্যিকের কাছে এটা প্রত্যাশিত নয়। তিনি শিল্প রচনার ক্ষেত্রে সমস্ত বিষয়কেই উদার মনে গ্রহণ করবেন এটাই স্বাভাবিক। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে সংলাপের ক্ষেত্রে যে ভাষা ব্যবহার হয়েছে তা সম্ভবতঃ কলকাতার চলতি কথ্যভাষা।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, কমলকুমার এবং নরেন্দ্রনাথের গল্পে তৎসম, তদ্ভব এবং ইংরেজী শব্দের ব্যবহার সম ভাবেই ঘটেছে। কমলকুমারের, 'বাগান পরিধি' গল্পে - 'প্লেন লিডিং হাই থিঙ্কিং অদৃশ্য হইয়াছে।' ... জি-বি-স যথার্থ বলিয়াছে। - এখানে একই সঙ্গে ইংরেজি কথ্য ও তৎসম শব্দ ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু কমলকুমারের গল্পে সংস্কৃত শ্লোকের ব্যবহার দেখা যায় - যেমন 'কালই আততায়ী' গল্পে - 'যথা প্রদীপ্ত, জ্বলনং পতঙ্গাঃ।' - ইত্যাদি। সংস্কৃত শ্লোকের এরকম ব্যবহার জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পে সেভাবে পাওয়া যায় না। নরেন্দ্রনাথের গল্প মধ্যবিত্ত কেন্দ্রিক তাই ইংরেজি শব্দ ও বাক্য ব্যবহার ঘটেছে অনায়াসে যেমন 'শাল' গল্পে apprentice 'Exprienced hand' ইত্যাদি। জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পেও ইংরেজি শব্দের বহুল ব্যবহার দেখা যায় - 'সমুদ্র' গল্পে - 'কেন, হোটেলের বোর্ডার-টোর্ডার যোগাড় করে দেয় তো শুনি।' ...'যেন একটা বেলার মধ্যেই আমি হেনার মতো 'বোরিং' বলে সমুদ্রের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নেব।"

নরেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী - সর্বদাই ছোট ছোট বাক্য ব্যবহার করেছেন কিন্তু কমলকুমার দীর্ঘবাক্য ব্যবহার করেছেন কিন্তু সংলাপ ব্যবহার একেবারেই নতুন ধরনের। কখনো পূর্ণবাক্য প্রয়োগই করেন নি অথবা কয়েকটি শব্দ-ই সব বুঝিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। - যেমন - 'দ্বাদশমৃত্তিকা' গল্পের সংলাপ এরকম -

'লেডী - আপনার বই দেওয়ার প্রয়োজন নাই ··· এখানেও অনেক ···
আমি সাপ্তাহিক মাসিক ছাড়া ···
ড - না না এই ছোট ছবি, কিন্তু তোমার সহিত কি মিল ···
তুমি আছ ···

আবার বিবরণের ক্ষেত্রে দীর্ঘ বাক্যের প্রয়োগ করেছেন যেমন 'রুক্মিনীকুমার' গল্পে -

অধুনা কান্নার শব্দ ও সুরম্য হরিধ্বনি ও গঙ্গার রমণীয়
বায়ু সংমিশ্রণ তাহাকে মুহূর্তের মধ্যেই ব্রণবিরহিত করে, সে
স্থির যে পুরুত মশাইকে কোন কথা প্রশ্ন করিবে না এবং সে
ঘাট পরিত্যাগ নিমিত্ত সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিল, গ্যাসের
আলোর দেওয়ালে পতিত অনেক ধর্ম্মকথা শ্রবণ ব্যাপৃতদের কম্পমান
ছায়ার অন্ধকার পার হইতেই, শুনে সেই মহতী ঘোষণা যে, হে
প্লবঙ্গ, আমি তোমার হৃদয়ের শুভাশুভ সব জানি ··· হৃদিস্থং
সর্বভূতানামাত্মা বেদ্ শুভাশুভম্।'(পৃ·১৮৫)

তার ভাষায় কোন নির্দিষ্ট ব্যাকরণ নেই। 'ছিল'র বদলে 'আছিল' অথবা 'নেহারিল' 'মন্তব্যিল' ইত্যাদি শব্দ অনায়াসেই ব্যবহার করেছেন।

নরেন্দ্রনাথ এবং জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে বিবরণের ক্ষেত্রে এরকম দীর্ঘ বাক্য ব্যবহার দেখা যায় না। কমলকুমারের ভাষায় ক্রিয়াপদের ব্যবহারও হয়েছে অপ্রচলিত প্রথায়। তিনি ইংরেজি is বা are -এর অনুরূপ 'হয়' ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন, যেমন 'সে হয় কানাই, সে না হয় যজল' (জল, পৃ·১৫)।

কিন্তু নরেন্দ্রনাথের গল্পে এ ধরনের ক্রিয়াপদের ব্যবহার নেই। যেমন 'কাঠগোলাপ' গল্পে অনিমা শুনে মন্তব্য করল - 'ভদ্রলোক তো ভারি অভদ্র' - বাংলা ভাষার স্বাভাবিক রীতিটিই এখানে বজায় রয়েছে। কিন্তু এই বাক্যটির ইংরেজী করলে is -এর ব্যবহার হত এবং কমলকুমারের রীতি অনুসারে হতো 'ভদ্রলোক তো হয় ভারি অভদ্র'। নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে কমলকুমারের ভাষা ব্যবহারে এখানে বৃহৎ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পেও এ ধরনের ক্রিয়াপদের ব্যবহার দেখা যায় না। কমলকুমারের রচনার ক্ষেত্রে প্রথম দিকে তিনি চলিত গদ্য বা ভাষা ব্যবহার করেছেন যেমন 'জল' গল্পে। "তবু এবার একবার সে চেষ্টা করল, ছোট টিনের ল্যাম্পের মধ্যে তেল ছিল বা। ছোট একটু আলো হল, তখন সে ছোট ঘরটার চারিদিকে চাইল', অন্ধকার নেই, আবছায়া হয়েছিল ...'(পৃ.৩২)। অথবা 'মল্লিকাবাহার' গল্পে - 'শোভনার চোখে অন্য এক আলো এসে পড়েছে, তার চোখে মুখে দেখা যাবে পুরুষালি দীপ্তি, ...' কিন্তু 'রুক্মিনীকুমার' থেকেই তিনি সাধু ভাষায় রচনা করতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং ক্রমশ ভাষার জটিলতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সংলাপের ক্ষেত্রেও ক্রমশ তিনি সাধুগদ্যের ব্যবহার শুরু করেন। যেমন 'রুক্মিনীকুমার' গল্পে - 'লবঙ্গলতা চোখ তুলিয়াছিল, দেখিয়াছিল অসহায় রুক্মিনীকুমার' আবার সংলাপেও সাধু ভাষায় প্রয়োগ ঘটেছে এই গল্পেই দেখা যায় - 'রুক্মিনীকুমার উত্তর দিয়াছিল 'আমার আপনাকে বারংবার দেখিতে ইচ্ছা হয়।' অথবা -- 'না ... আমি সবই শুনিয়াছি ... দেখিয়াছি'। (পৃ.১৮৮) নরেন্দ্রনাথ মিত্র ও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে সাধু ভাষা ব্যবহারের কোনরকম প্রচেষ্টাই দেখা যায় না। এবং কমলকুমারের গল্পের ক্ষেত্রে ভাষা নিয়ে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা লক্ষ্য করা যায় নরেন্দ্রনাথ বা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গল্পে সে ধরনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় না। 'ছন্দ স্পন্দ সৃষ্টির প্রয়োজনেই, কমলকুমার

অনেক সময় বাক্য মধ্যে সর্বনাম, বিশেষণ বা অব্যয়ের বিন্যাসক্রমে, মাঝে মাঝেই এক ধরনের বাধাপ্রাপ্ত অনুয় জটিলতা আনেন যা একমাত্র বাক্যান্তর্গত ছন্দস্পন্দের যতি অনুসারী পথে, একই সঙ্গে অর্থ ও রচনা সৌন্দর্যের সামঞ্জস্য রূপ, কিন্তু ছন্দস্পন্দকে উপেক্ষা করার ফলে, গদ্যের এহেন আপাত-বিষম বিন্যাসই, আবার বাচ্যার্থ-অনুধাবনের প্রধান অন্তরায় হয়ে ওঠে।'[৪০] যেমন - 'প্রায়ই দীঘল ঘোমটা রমনীগণের ছিন্নবস্ত্র হেতু যাহাদের, তাই হয় কেশরাশি, হয় একটি কান, ...। কমলকুমার পরিপ্রেক্ষিত ও চরিত্রসংগঠনে ভাষার অপূর্ব প্রয়োগে অভিনবত্ব, সৃষ্টি করেছেন, যেমন - নিম-অন্নপূর্ণা গল্পে ক্ষুধার্ত বালিকার 'জল গিলে গিলে' খাওয়া। অনুষঙ্গ সদৃশতা আর ভাষায় ভাবগত-রূপগত সামঞ্জস্য বিধান ... তাঁর বাক্য গঠনের বহু মাত্রিক বৈভবই তো প্রতিষ্ঠিত করে।'[৪১] ভাষা ব্যবহারের কৌশলে বিষয় বা বস্তুকে দৃশ্যগোচর এবং শ্রুতিগোচর করে তোলা কমলকুমারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নরেন্দ্রনাথ এবং জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পে ভাষার এই বৈশিষ্ট্য তেমন ভাবে লক্ষ্য করা যায় না। জ্যোতিরিন্দ্রের ভাষায় অবশ্য স্বাদ, গন্ধ, স্পর্শের অনুভূতি প্রধান হয়ে উঠেছে। নরেন্দ্রনাথ তার বিভিন্ন গল্পে রবীন্দ্রনাথের গানের বা কবিতার পংক্তি অনায়াশেই ব্যবহার করেছেন, যেমন 'পত্র বিলাস' গল্পে মিনু আবৃত্তি করে -

যা কিছু জীর্ণ আমার দীর্ণ আমার জীবন হারা।
তাহারি স্তরে স্তরে পড়ুক ঝরে সুরের ধারা।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বা কমলকুমারের গল্পে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের বা গানের পংক্তির এরকম ব্যবহার দেখা যায় না।

(৪)

ছোট্ট গল্প রচনার ক্ষেত্রে 'ছোটগল্পের বর্ণনা হবে ব্যঞ্জনা প্রধান ও গল্পের পক্ষে অপরিহার্য।'[৪২] তবে বর্ণনাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে সংলাপের দ্বারাও গল্প রচিত হতে পারে। আলোচ্য তিন শিল্পী - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, কমলকুমার, ও নরেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে বর্ণনাকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র সংলাপকে অবলম্বন করে কোন গল্পই রচিত হয়নি। ছোটগল্পের শিল্পীরা গল্পের প্রয়োজনে কখনো বর্ণনা দীর্ঘতর করে থাকেন। সেটা প্রাচ্য পাশ্চাত্য উভয় গোষ্ঠীর শিল্পীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য গল্পের আড়ম্ভও দীর্ঘ বর্ণনা দিয়ে হতে পারে। দীর্ঘ বর্ণনা প্রয়োগের চেষ্টা কমলকুমারের গল্পের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। যেমন তার 'মল্লিকাবাহার' গল্পের শুরু হয়েছে দীর্ঘ বর্ণনার মধ্যে দিয়ে -

'আয়না এখন, আঁচল দিয়েই মুছে, এবার যথাযথ প্রতিফলিত, এবং অতীব স্পষ্ট। যদিও যে ছোট আয়না, তৎসত্ত্বেও আবক্ষ দেখা যায়, যখনই যেখানেই ঈষৎ ফাঁক সেখানে সেখানে দীন ঘরের, স্যাঁতসেঁতে ঘরের এটা-সেটা। ... এই পুরুষোচিত ক্লান্তির ক্ষেত্রে এ সকল যে ম্রিয়মান, নিষ্ক্রিয়।'[৪৩] আবার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'জ্বালা' গল্পের শুরু হয়েছে মধ্যাহ্নের দীর্ঘ বর্ণনা দিয়ে। এই বর্ণনার মধ্যে দিয়ে গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নের পরিবেশকে ভয়ংকর করে তোলা হয়েছে। এই বর্ণনার মধ্যে দিয়ে গল্পের এক নিষ্ঠুর ভয়ংকর মানুষের উপস্থিতি যেন পাঠক মনে আগাম পৌঁছে দিতে চান লেখক। যেমন -

> এত বড় ... বস্তুত গরমটা যত বাড়ছে, চার দিকের শব্দ-টব্দগুলো যেন তত কমে আসছে। ... মানুষ হাঁটছে না, বাইরে রাস্তায় গাড়ি, ঘোড়া চলছে না, কোনো বাড়ির শিশু কাঁদছে না রেডিও খুলছে না কেউ। ভয়ে ? প্রচণ্ড গ্রীষ্ম রক্ত চক্ষু মেলে সব কিছু থামিয়ে দিয়েছে সবাইকে শাসাচ্ছে চুপ, চুপচুপ। আমার প্রতাপ দেখ, আমার প্রতাপ দেখ। আমি কেমন নিষ্ঠুর, কত ভয়ংকর হতে পারি তোমরা টের পাও। ...[৪৪]

ছোট গল্প রচনার নানা প্রণালীর মধ্যে সবচেয়ে যে পদ্ধতি লেখকেরা অবলম্বন করেছেন সেটা হলো 'Direct Method' এই পদ্ধতিতে গল্পে গল্পলেখকই সর্বজ্ঞ। গল্পের কার্যকারণ, চরিত্রের মনের কথা সবই তাঁর কাছে সুস্পষ্ট। এছাড়া রয়েছে আত্মজীবনীমূলক পদ্ধতি (Autobiographical) এই পদ্ধতিতে গল্পের কোন চরিত্রের জবানীতেই সমগ্র ঘটনা বর্ণিত হয়। আমাদের আলোচ্য তিন শিল্পীর মধ্যে নরেন্দ্রনাথের গল্পে এই দুটো পদ্ধতিরই ব্যবহার দেখা যায়। যেমন বিখ্যাত 'রস' গল্পে প্রত্যক্ষরীতির (Direct Method) ব্যবহার দেখা যায়। লেখকই এখানে সর্বজ্ঞ, গল্পের শুরু করেছেন লেখক এই ভাবে -

> কার্তিকের মাঝামাঝি চৌধুরীদের খেজুর বাগান ঝুরতে
> শুরু করল মোতালেফ। তারপর দিন পনের যেতে না
> যেতেই নিকা করে নিয়ে এল পাশের বাড়ির রাজেক মৃধার
> বিধবা স্ত্রী মাজু খাতুনকে।[৪৫]

চরিত্রের মনের কথাও লেখকই বলেছেন পাঠককে -

> ... চাউনিটা একটু তেরছা তেরছা মোতালেফের।
> বেছে বেছে সুন্দর মুখের দিকে তাকায়। সুন্দর মুখের
> খোঁজ করে ঘোরে তার চোখ। অল্পবয়সী খুবসুরৎ
> চেহারার একটি বউ আনবে ঘরে, এতদিন ধরে সেই
> চেষ্টাই সে করে এসেছে।[৪৬]

কমলকুমারের গল্পেও এই প্রত্যক্ষ রীতির ব্যবহার দেখা যায় যেমন 'তাহাদের কথা' গল্পে -

> আতা গাছটির পাশেই জ্যোতি দাঁড়িয়েছিল। এখন পড়ন্তবেলা ...
> এতে করে তার মনের অধৈর্য্য আরও যেন বেশী করে প্রকাশ
> পায়। সে ক্ষুৎপিপাসা কাতর, না অন্য কোন যন্ত্রণায় অসহিষ্ণু
> সে নিজেই জানে না। সম্মুখে সুদীর্ঘ রাস্তা, জ্যোতি তাকাল।[৪৭]

আধুনিক গল্পকারদের মধ্যে অনেক সময় আকস্মিক চমক সৃষ্টি এবং নাটকীয়তা প্রয়োগ করতে দেখা যায়। ঘটনা উপস্থাপনায় নরেন্দ্র নাথ আকস্মিকতাকে প্রশ্রয় তেমনভাবে দেননি। কিন্তু নাটকীয়তা সৃষ্টিতে দুই শিল্পীই উপযুক্ত সমভাবে। উত্তেজনাময় পরিস্থিতি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে দেখা যায়, যেটা নরেন্দ্রনাথের গল্পে দেখা যায় না। নরেন্দ্রনাথের গল্পে মধ্যবিত্ত পরিবারের সহজ, সরল শান্ত সুরটিকেই উপলব্ধি করা যায়। কমলকুমারের 'কয়েদখানা' গল্পে একটা ভয়ংকর পরিণামের প্রস্তুতি দেখান - এই ভাবে -

> আর একজনের উষ্ণ নিশ্বাসে অন্যে ভীত, এ কারণে যে আসন্ন দাঙ্গার উৎসাহে সকলেই কিয়ৎ পরিমানে দুর্বল। এ ওকে ধাক্কা দেয়, অথচ পাতা ঝরার শব্দে, অথবা মহুয়া যখন বিচ্যুত তখন, প্রত্যেকেরই দৃষ্টি নিম্নে এবং গাছে যেখানে চন্দ্রালোক পুঞ্জিত সেখানে চকিত হয়। এ দৃষ্টি সন্দেহবাচক। কেহ আর ভীত।—[৪৮]

উত্তেজনাময় পরিস্থিতি রয়েছে কমলকুমারের 'জল', 'তাহাদের কথা' ইত্যাদি গল্পে। নাটকীয় চমক রয়েছে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'পতঙ্গ' গল্পের শেষে। অথবা 'গিরগিটি', 'নদী ও পরী' - ইত্যাদি গল্পে। নরেন্দ্রনাথের গল্পে এক একটি বাক্য ইঙ্গিতগর্ভ ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে। সেভাবেই কমল কুমারের 'তাহাদের কথা' গল্পে শিবনাথের উক্তি 'খুব ঠান্ডারে, খুব ঠান্ডা' - অথবা 'নিম অন্নপূর্ণা' গল্পে - প্রীতিলতা বলেছিল তার সন্তানদের 'নে খা-না তোরা'। আবার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'পতঙ্গ' গল্পে 'বৌদি মুর্গী খাবে, একটা মুর্গী কেটে দিয়ে এলাম' - পলাশের এই উক্তি, অথবা 'হিমির সাইকেল শেখা' গল্পে 'গরিবি হটাও গরিবি হঠাও' ইত্যাদি। নরেন্দ্রনাথ তার অনেক গল্পেই পত্ররীতির ব্যবহার করেছেন। যেমন 'ধূপকাঠি' গল্পের শুরু করেছেন চিঠির মাধ্যমে - 'মান্যবরেষু, আমি আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিতা। বিনা পরিচয়ে

আপনাকে এই চিঠি লিখতে বসেছি ...।" [৪৯] গল্পের শেষও করেছেন চিঠির আকারেই - 'অনধিকার চর্চার জন্য আর একবার মার্জনা চাইছি - ইতি - বিনীতা মাধুরী সেনগুপ্ত।' [৫০] পত্রের মধ্যে দিয়েই মানুষের মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিকে কাহিনীর আকারে লেখক পরিবেশন করেছেন। এ ধরনের পত্রের ব্যবহার কমলকুমারের বা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে দেখা যায় না।

ছোট গল্পের সার্থকতা অনেকখানিই নির্ভর করে এর নামকরণের ক্ষেত্রে। যদিও গল্পের গঠনের সঙ্গে নামকরণের যোগসূত্র অঙ্গাঙ্গীন নয়, কিন্তু নামকরণের বিষয়টি এ ক্ষেত্রে উপেক্ষণীয় নয়। নামকরণের ক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, কমলকুমার এবং নরেন্দ্রনাথ তিনজনই প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলেছেন। নরেন্দ্র-নাথ কখনো কোন তুচ্ছ বস্তুকেই অবলম্বন করে নামকরণ করেছেন যেমন 'টর্চ', 'টিকেট', 'শাল' 'দশ টাকার নোট' ইত্যাদি। আবার ব্যক্তির নামেও নামকরণ করেছেন - যেমন রত্নাবাঈ, চাঁদমিঞা - ইত্যাদি। আবার ব্যঞ্জনা ধর্মী নামের প্রতি তাঁর ঝোঁক অধিক পরিমানে সেটা লক্ষ্য করা যায় - যেমন 'বিকল্প', অবতরনিকা' ইত্যাদি। ব্যঞ্জনাধর্মী নামপ্রয়োগের প্রবণতা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ও কমলকুমারের মধ্যেও দেখা যায়। ব্যক্তির নামে নামকরণ কমল কুমার করেছেন - 'মতিলাল পাদরী', 'রুক্মিনী কুমার' ইত্যাদি গল্পে।

—

কমলকুমারের গল্পে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। বিদেশে ম্যাজিক রিয়েলিজম্ নামে একটি কথা চালু হয়েছে তার ইঙ্গিত কমল-কুমারের 'মতিলাল পাদ্রী', 'তাহাদের কথা' গল্পে পাওয়া যায়। এই সব গল্পে চরিত্রও পটভূমির বাস্তব, নিছক চাক্ষুষ বাস্তব নয়। চরিত্রগুলির মাথার পেছনে সময়ের পরি-প্রেক্ষিত বদলে বদলে যায়। তার গল্পে ব্যষ্টি সমষ্টিতে মিলে যায়, সমষ্টি জীবন মানেই জীবনের এক সামাজিক সত্য। কমলকুমারের আঙ্গিকের মৌলিক নিজস্বতা তার বিষয়ের এই

সামাজিকতার সঙ্গে যুক্ত। তার গল্পে ঘটনাপ্রবাহ নেই, সংঘাতজনিত গতিময়তা নেই, নাটকীয়তা নেই, যেটা দেখা যায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বা নরেন্দ্রনাথের গল্পে। কমল কুমারের অনেক গল্পেই সারাংশ বলে কিছু হয় না। যেমন 'বাগান' সিরিজের গল্প গুলিতে। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের সব গল্পেরই মধ্যে একটা কাহিনী খুঁজে পাওয়া যায়। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পেও কাহিনী খুঁজে পাওয়া যায়, ব্যতিক্রমী গল্প 'গাছ' - এ গল্প অনেকটাই কবিতার মতো।

নরেন্দ্রনাথের গল্পের শুরু তুচ্ছতার পটভূমিতে পরিণতিতে তা বৃহত্তর সত্যে উদ্ভাসিত, ঘটনা অপেক্ষা বড় হয়ে উঠেছে মানুষের মনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া - যেমন 'রস' গল্পটিতে দেখা যায় পুরো এক বছরের কাহিনী লেখক বর্ণনা করেছেন। গল্পের শুরু হয়েছে তুচ্ছ রসের গাছির বিবাহ প্রসঙ্গ দিয়ে, কিন্তু গল্প রস গাঢ় হয়ে গভীরতর হয়েছে গল্পের সমাপ্তিতে। এই 'রস' গল্পটি stair-step plot বা সোপানধর্মী প্লটের অর্ন্তভুক্ত। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'নদী ও নারী', 'পতঙ্গ' ইত্যাদি গল্পেও এই সোপানধর্মী প্লটের ব্যবহার দেখা যায়। নরেন্দ্রনাথের এই 'রস' গল্পের মতো বেশ কিছু গল্পেই গল্পরস ঘনীভূত হয়েছে গল্পের একেবারে শেষে, মোপাসাঁর বেশীর ভাগ গল্প এই জাতীয়। কমলকুমারের গল্পগুলি আবার বহুতল ক্রিস্টালের মতো নানা মোচড়ে বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় উদ্ভাসিত। কিন্তু মানুষের মনের নানা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া তার গল্পে বড় হয়ে ওঠে নি। নরেন্দ্রনাথের অনেক গল্পেই আগে পরে ঘটনাবিন্যাসের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, এর ফলে পাঠক চিত্ত শেষ পর্যন্ত কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষা করে। তার কিছু গল্পের মধ্যে একটি বিশেষ দিক লক্ষ্য করা যায় সেটা হল গল্পের মধ্যে গল্প বলা যেমন চাঁদ-রূপচাঁদ তার অতীত জীবনের কাহিনীকে তুলে ধরেছেন গল্পের আকারে। এই পথটি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বা কমলকুমারের মধ্যে দেখা যায়না। তাদের অধিকাংশ

গল্পেই লেখক বলে যান সর্বজ্ঞ হিসেবে। 'ছোট গল্প রচনার ক্ষেত্রে অনেক সময় অন্যতম পদ্ধতি হল গল্পের কথক 'আমি'। এই 'আমি'র বিশেষত্ব আছে। 'গল্পের সঙ্গে সেই 'আমি'র সংযোগ নিবিড় নয় - তিনি গল্পের একজন চরিত্র হতে পারেন আবার না-ও হতে পারেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের কিছু গল্পে দেখা যায় শ্রোতা 'আমি' আর বক্তা অন্য কেউ। যেমন 'পুরাতনী' গল্পের শ্রোতা 'আমি' কিন্তু বক্তা রীনা। গল্পটি রীনার নয়, তার বান্ধবী চিত্রাঙ্গদার জীবনের। এই পদ্ধতি দ্বারা তিনি গল্পে নাটকীয়তা সৃষ্টি করতে পেরেছেন। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কমলকুমারের গল্পে এ ধরনের পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায় না।

এই তিন শিল্পীই - শৈশবে চিত্র-কলার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু কমল কুমার দীর্ঘ-সময় পর্যন্ত সেই চর্চায় নিযুক্ত ছিলেন। এই তিন শিল্পীর গল্পেই - সেই চিত্রের ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু চিত্ররূপময়তা অধিক পরিমানে লক্ষ্য করা যায় কমলকুমারের গল্পে। কারণ জীবনের পরিণত বয়সে এই চিত্রের জগতেও তিনি মনো-নিবেশ করেছিলেন, যার ফলে এই শিল্প সম্পর্কে গভীর জ্ঞান তার জন্মে ছিল যার প্রভাব গল্পগুলিতেও লক্ষ্য করা যায়। তাঁর বিভিন্ন গল্পে জলরঙে আঁকা এক একটি পূর্ণ, ছবি আমরা পেয়ে যাই। "ছোট গোল রূপালী জলাময় - যার কিনারে হলদেটে সবুজ ত্রস্তাগত খাড়া খাড়া জলজ-ঘাস, সেখানেই জলের উপর দিয়ে তার পিঙ্গল ছায়াটা জোর করে চলে যায় ...। ঘোড়ার পিছনে উত্তরে বহুদূরে অনেক পাহাড় এবং তাল গাছের জোটের মধ্যে দিয়ে দিয়ে চড়াই-উৎরাইয়ের রেখা উত্থিত।'[৫১] জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীও একসময় ছবি আঁকতেন। তাঁর 'গাছ' গল্পে 'বর্ণপ্রতীকের জীবন্ত চলিষ্ণুতা'[৫২] লক্ষ করার মতো, গল্পে দেখা যায় 'লালের স্পর্শ পেয়েই ঈর্ষার সবুজ এখানে প্রেমের আর প্রাণের সবুজে রূপান্তরিত হয়েছে।'[৫৩] আর নরেন্দ্রনাথের গল্পে পূর্ব-বাংলার ছবি

যেখানে এঁকেছেন তা সবুজ রঙে সজীব হয়ে উঠেছে -

> মাঠ তো নয় সমুদ্র। এবার কার্তিকের শুরুতেই
> লক্ষ্মীদীঘা ধান পেকেছে। কিন্তু মাঠের জল এখনো
> তেমনি দাঁড়িয়ে।[৫৪]

অথবা 'রস' গল্পে 'আমের গাছ বোলে ভরে উঠল, গাব গাছের ডালে ডালে গজাল তামাটে রঙের কচি কচি নতুন পাতা।'[৫৫] কমলকুমার কাঠখোদাই-এর কাজে জীবনের একটা সময়ে মনোনীবেশ করেছিলেন। তাঁর 'কয়েদখানা' গল্পের শাজাদাকে সেই 'উড্‌কাটিং' মনে হয় -

> লোকটি ঢ্যাঙা, পুরুষাকারে দৃপ্ত আড়া, কঠোর মুখের
> তলে অল্পহিংসেবী তীরেলাদাড়ি। ... সব থেকে সুন্দর তার
> পদদুয়, মনে হয় কাঠেই কোঁদা, কড়া হাঁটু - তার
> পাশেই আঁটলি মাংসপেশী।[৫৬]

- এ ধরনের নিখুঁত কাঠ খোদাই-এর ভাস্কর্যের সন্ধান নরেন্দ্রনাথের বা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে পাওয়া যায় না।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে নির্দিষ্ট কোন সময়কে খুঁজে পাওয়া যায় না, কিন্তু নরেন্দ্রনাথের গল্পে এবং কমলকুমারের কিছু গল্পে বিশেষ সময়কে স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। নরেন্দ্রনাথের বেশ কিছু গল্পে দেশ বিভাগ, দাঙ্গা ধৃষ্ট যে সময় তাকে পাঠক অনুভব করে। যেমন - 'পালঙ্ক', 'কাঠগোলাপ' ইত্যাদি গল্পে। এছাড়া যুদ্ধের সময় যে খাদ্য সংকটের পাশাপাশি বস্ত্র সংকট দেখা দিয়েছিল ভয়াবহভাবে সেই সময়কে অনুভব করা যায় নরেন্দ্রনাথের 'আবরণ' গল্পে। যুদ্ধের ফলে যে মন্বন্তর বাঙালীর জীবনকে বিধ্বস্ত করেছিল সেই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি বা সময়কে পাওয়া যায় 'মদনভস্ম', 'পুনশ্চ' ইত্যাদি গল্পে। 'পুনশ্চ' গল্পে দেখা যায় -

যুদ্ধের দরুণ গৃহস্থালীর খরচা ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল। তাঁর আর খোনা হল না ...

অথবা এই গল্পেই দেখা যায় -

তারপর এল সেই দেশ জোড়া দুর্ভিক্ষ। হাটে বাজারে ধার মিলে না, ... বাড়িতে হাড়ি চড়ে না।

'জৈব' গল্পে রয়েছে - 'দাঙ্গার সময়কার ঘটনা। ... দাঙ্গাহাঙ্গামার জের তখনও চলবে ...' ইত্যাদি প্রসঙ্গ। কমলকুমারের 'নিম অন্নপূর্ণা' গল্পে সেই যুদ্ধকালীন সময় এবং যে পরিস্থিতিতে মানুষ লঙ্গরখানায় দাঁড়িয়েছিল সেই সময়কে পাঠক অনুভব করতে পারে। এ গল্পেই কমলকুমার যুদ্ধের পরিস্থিতিতে অতি সংক্ষেপে দেখিয়েছেন -

... এ সময় এক ঝাঁক বোমারু বিমান উড়ে যাওয়ার মর্মভেদী শব্দে ঐক্য ক্রন্দনধ্বনি আর ছিল না, ছেলে মানুষ দুটির মুখে শুধুমাত্র ক্রন্দনের ভঙ্গীমাত্র ছিল। ক্রন্দনের অভিব্যক্তি কি অছবি লা। (পৃ.১২৯)

অথবা -

আমার ইচ্ছে করে গলায় দড়ি দিতে, না লেখা না পড়া, খালি খাই ... খাই ... কোথাকার দুর্ভিক্ষ হাভাতের ঘর থেকে যে এসেছে ভগবান জানেন ...

এছাড়া ব্রজ 'ভাবছিল নয়ত পাচ্ছিল - ভয়ঙ্কর দুঃসহ গলিত ঘৃন্য কদর্য্য গন্ধ অনেক মৃতদেহের গন্ধ - মানুষেরা কি আদতে মাছ - অভুক্ত তথা বুভুক্ষ-জীবিতদের শবের গন্ধ নিশ্চয়ই এরূপই হয় ...।" বস্তুতঃ কমলকুমার ব্যক্তিগত জীবনে এই ভয়ংকর সময়ের পরিস্থিতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, যার থেকে তিনি

এক মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। লোঙ্গরখানার প্রসঙ্গ এ গল্পেই রয়েছে, বৃদ্ধ বলে -'আজ এক ...' এক ভদ্রলোক লোঙ্গর খানায়'। অথচ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী একই সময়ের লেখক হলেও তার গল্পে এই যুদ্ধকালীন সময় বা দুর্ভিক্ষ পীড়িত সময় প্রসঙ্গ-ক্রমে এলেও প্রধান হয়ে ওঠে নি। যার ফলে নির্দিষ্ট করে সেই সময়কে তার গল্পে আমরা পাই না। ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল গল্পে দৃষ্টিভঙ্গির একমুখিনতা। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, কমলকুমার এবং নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পে ক্ষেত্রে দৃষ্টি-ভঙ্গির একমুখিনতা সার্থকভাবে প্রয়োগ ঘটেছে নরেন্দ্রনাথের গল্পে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বিখ্যাত গল্প গুলির মধ্যে যেমন গিরগিটি, 'বনের রাজা' - ইত্যাদিতে এই একমুখিনতা লক্ষ্য করা যায়। আবার কমলকুমারের যে রচনায় গল্পরস রয়েছে যেমন 'জল', 'তাহাদের কথা', 'নিমঅন্নপূর্ণা' ইত্যাদি গল্পে এই একমুখিনতার প্রয়োগ ঘটেছে। নরেন্দ্রনাথের বেশির ভাগ গল্পেই গল্পরস জমাট বেঁধেছে, সেক্ষেত্রে লেখকও গল্পের একমুখিনতার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন যেমন 'রস', 'পালঙ্ক', 'টিকিট', 'জায়া', 'বিকল্প' ইত্যাদি গল্প।

ছোটগল্পের সমাপ্তি বা পরিণতির মোপাসাঁ এবং চেকভ দুটি বিশিষ্ট রীতির প্রবর্তন করেছিলেন। 'মোপাসাঁর' গল্পের পরিণতিকে বলা হয় Whip-crack ending অর্থাৎ চাবুকমারা আকস্মিক পরিণতি, আর চেকভ-এর গল্পের পরিণতিকে বলা হয় Logical conclusion অর্থাৎ-সত্বর অনিবার্য-যুক্তিযুক্ত পরিণতি।'[৫৭] নরেন্দ্রনাথের গল্পে এই অনিবার্য যুক্তিযুক্ত পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। গল্পের পরিণতিতে আকস্মিক চমক সৃষ্টিতে তিনি আগ্রহী ছিলেন, মানুষের জীবনের ব্যর্থতা তার গল্পে অনুত্তেজিত ভঙ্গিতেই রূপায়িত হয়েছে, শান্ত স্বাভাবিক পরিণামে তার গল্প শেষ হয়।

নির্মম ব্যঙ্গ তার গল্পে নেই বরং রয়েছে মানুষের জন্য সমবেদনা। নরেন্দ্রনাথের 'হেডমাস্টার' গল্পটির পরিণতিতে রয়েছে open endedness যে উন্মুক্ত - পথ ধরে বাস্তবতার বিভিন্ন দিকে দৃষ্টি রাখা যায়। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের পরিণতিতে অনেক সময়ই আকস্মিকতা লক্ষ্য করা যায় যেমন 'বন্ধুপত্নী' গল্পের পরিণতিতে দেখা যায় অরুণা শারিরীক সান্নিধ্যের বিনিময়ে স্বামীর বন্ধুর কাছ থেকে অর্থ সাহায্যের মাধ্যমে সংসার স্বামী নিয়ে বাঁচার চেষ্টা করে। এ গল্পে রয়েছে সমাজের প্রতি এক ধরনের বিদ্রুপ। অথবা 'পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা' গল্পেও রয়েছে আকস্মিক পরিণতি যেখানে কুন্দ বলে -

... পায়ের কাটা ঘা কদিন থাকে, ঘা শুকোয়
না মনের।

এ ধরনের শেষ মুহূর্তের অপ্রত্যাশিত চমক তার গল্পকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছে। কমলকুমারের কিছু গল্পের পরিণতিতে চাবুকমারা আকস্মিকতা লক্ষ্য করা যায় সেখানে তিনি উচ্চবিত্ত, তথাকথিত সম্ভ্রান্ত সমাজের ভন্ডামীকে উদ্‌ঘাটিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। যেমন - 'নৃত পূজাবিধি'তে সমাজের উচ্চবিত্ত মানুষের ফাঁপা মূল্যবোধকে ব্যঙ্গ বিদ্রুপের মধ্যে দিয়ে লেখক তুলে ধরেছেন। এ গল্পের পরিণতিতে দেখা যায় শিক্ষক - 'হুইসিল বাজাইলেন, লাইন কর, ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও মৃত শিশুকে ... তুরা কর।'(পৃ.১১৮) জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী 'রাক্ষসী' গল্পের পরিণতিতে রয়েছে জিজ্ঞাসা চিহ্ন (pointing Finger) তার রাক্ষসী হয়ে ওঠাতে দায়ী কে ? - এই জিজ্ঞাসায় গল্পের সমাপ্তি।

বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালীন সময়ের অন্যতম গল্পকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছোট গল্পের প্রতীক ধর্মিতার উপরে গুরুত্ব দিয়েছেন। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নরেন্দ্রনাথ এবং কমলকুমারের গল্পে এই প্রতীকধর্মিতা লক্ষ্য করা যায়। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'চোর' গল্পে তুচ্ছ পেঁপে চারা চুরিকে কেন্দ্র করে যে একটি শিশুর হৃদয়ও তার মা'র কাছ থেকে

তার নিজস্ব পরিবেশ থেকে চুরি হয়ে যাচ্ছিল সেটাই লেখক দেখাতে চেয়েছেন। অথবা 'চন্দ্রমল্লিকা' গল্পে বিভিন্ন ফুলের স্থায়ীত্ব দিয়ে পরস্পরের সম্পর্কের স্থায়ীত্বকে লেখক বুঝিয়েছেন যেমন নটা-বারোটা ফুল সম্পর্কে বিনতার মানসিকতা হল - এই ফুল সুন্দায়ু কিন্তু - 'তাতে কি, যতক্ষন বাঁচল সুন্দর হয়ে বাঁচল'।[৫৮] এখানে বোঝাই যায় বিনতার স্বামী অপরেশও সুন্দায়ু ছিল কিন্তু যতদিন বেঁচে ছিল বিনতার কাছে সে সুন্দর ছিল।

কমলকুমারের 'তাহাদের কথা' গল্পে প্রদীপ জালানোর প্রসঙ্গ রয়েছে। এ গল্পে দেখা যায় হেমাঙ্গিনী তার মেয়ে অন্নপূর্ণা অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জনকে সমর্থন করে এবং প্রথম উপার্জিত টাকা নিয়ে বাড়িতে এলে মা তাকে বলে - 'উঁহু আমি প্রদীপটা জ্বেলে দি আগে ঠাকুর প্রণাম কর, প্রথম মাইনে।[৫৯] কিন্তু অন্নপূর্ণা তার এভাবে অর্থ উপার্জনকে মনে প্রানে সমর্থন করে না তাই সেভাবে 'ঘরের সুন্দান্ধকারে এই পালা শেষ হলে ভাল হত।'[৬০] তার পরেই লেখক খুব ছোট একটি বাক্য ব্যবহার করেছেন - 'আলো জ্বলল'।[৬১] কিন্তু এই আলো জ্বলার মধ্যে দিয়েই শিবনাথের জীবনে অন্ধকার নেমে আসা প্রতীকায়িত হয়। এ আলো সত্যতাকে নির্ভর করে জ্বলে না, এ আলো মানুষকে কোন শুভ পথ দেখায় না। কারণ গল্প অগ্রসর হলেই দেখা যায় - 'সহসা প্রদীপের চচ্চড় শব্দে হেমাঙ্গিনীর গলা স্তিমিত হল, প্রদীপে বোধ করি জল ছিল।'[৬২]

নরেন্দ্রনাথের বিভিন্ন গল্পেও প্রতীকধর্মিতা লক্ষ্য করা যায়, যেমন 'টিকিট' গল্পে শীতাংশু ট্রামে টিকিট ফাঁকি দিতে পারাকে পৌরুষের কাজ বলে মনে করে, সেভাবে 'সেও অদূর ভবিষ্যতে পৌরুষের পরিচয় দিতে পারবে একদিন' - কিন্তু সে যে কতখানি কাপুরুষতার কাজ করল, নিজের মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে সেটা গল্পের শেষ বোঝা যায়।

অথবা 'রস' গল্পে খেজুর গাছ কাটার কৌশল সম্পর্কে বলেছেন যে - 'কাটতেও হবে আবার হাত বুলাতেও হবে। খেয়াল রাখতে হবে গাছ যেন ব্যথা না পায়, যেন কোন ক্ষতি না হয় গাছের।' এই বিশেষ কৌশল মোতালেফ শুধু গাছের ক্ষেত্রেই না - মাজু খাতুনের মনের ওপরেও প্রয়োগ করে।

এই তিন শিল্পী একই সময়ের মানুষ হলেও তাদের শিল্প ভাবনা বা শিল্প সৃষ্টি ছিল ভিন্নপথগামী তিনটি পৃথক নদীর স্রোতের মতো। নরেন্দ্রনাথ তার সময়ে ছিলেন জনপ্রিয় লেখক আবার সমান ভাবেই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ও কমলকুমার পাঠক মহলে ছিলেন সমালোচনার দ্বারা সমৃর্ধিত। পরবর্তী সময়ের কষ্টি পাথরে এই দুজনের রচনা যাচাই হয়ে খাঁটি সোনার মর্যাদায় ভূষিত হয়েছে।

তথ্যপঞ্জী

১. কমলকুমার মজুমদার : কিছু পুরানো কথা - রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, শব্দ পত্র, সেপ্টেম্বর ১৯৮৪

২. প্রণয় পত্রাবলী - নরেন্দ্রনাথ মিত্র - সংকলন ও সম্পাদনা - প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, শারদীয় দেশ, ১৪০৩

৩. নদী ও নারী - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, পৃ.১

৪. সামনে চামেলি - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, পৃ.২৮৫

৫. জল - গল্প সংগ্রহ - কমলকুমার মজুমদার - সম্পাদনা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পৃ.৪১

৬. মল্লিকাবাহার - তদেব, পৃ.৬৬

৭. পালঙ্ক - গল্পমালা - ১ম - নরেন্দ্রনাথ মিত্র পৃ.২৪১

৮. ফেরিওয়ালা - তদেব পৃ.

৯. কমলবাবু - সত্যজিৎ রায় - কমলকুমার রচনা ও স্মৃতি - সম্পাদনা সুব্রত রুদ্র, পৃ.১৪৬, ১৯৮২

১০. রাক্ষসী - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী,

১১. বন্ধুপত্নী - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নির্বাচিত গল্প, সম্পাদক - নিতাই বসু পৃ.৮৫

১২. অবতরণিকা - নরেন্দ্রনাথ মিত্র - গল্পমালা পৃ.১২২

১৩. মল্লিকাবাহার - কমলকুমার, গল্পসমগ্র - সম্পাদনা - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৯২, পৃ.৬৬

১৪. রস : আনিস্ জামান, নরেন্দ্রনাথ মিত্র সংখ্যা, সম্পাদক সাদ কামালী, আবহমান ভাষা, পঞ্চম সংখ্যা ১৩৯৯, পৃ.৩১

১৫. রস : একটি অনির্বাপিত আগুনের গল্প - কবিতা চক্র, সাহিত্য সংস্কৃতি। সম্পাদক - সঞ্জীবকুমার বসু, পৃ.১৭৯

১৬. জল - কমলকুমার মজুমদার, গল্পসংগ্রহ, সম্পাদনা - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৯২, পৃ.৪৩

১৭. হিমির সাইকেল শেখা - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বাছাই গল্প, পৃ.৫২

১৮. বাদামতলার প্রতিভা - তদেব, পৃ.১৪৫

১৯. ওয়াং ও ও খেলা ঘরে আমরা - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, দেশপত্রিকা, শারদীয় সংখ্যা, ১৯৮০

২০. বনের রাজা - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নির্বাচিত গল্প, সম্পাদক - নিতাই বসু, পৃ.৭৬

২১. তদেব, পৃ.৭৭

২২. তদেব

২৩. গাছ - তদেব, পৃ.৫৯

২৪. তদেব

২৫. শাল - নরেন্দ্রনাথ মিত্র

২৬. মাছ - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বাছাই গল্প, সম্পাদক - সুব্রতরুদ্র - অজয় দাশগুপ্ত

২৭. টিকিট - নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা ১ম, পৃ.১১৯

২৮. দ্বাদশমূর্তিকা - কমলকুমার মজুমদার, গল্পসমগ্র - সম্পাদক - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

২৯. ছোটগল্পের কথা - রথীন্দ্রনাথ রায়, ১৯৫৯, পৃ.১৪

৩০. শ্রীপুলিন বিহারী সেন কর্তৃক সংকলিত রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের তথ্যপঞ্জী পৃ.৪১

৩১. সাক্ষাৎকার লোথার লুৎসে - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বাছাই গল্প - সম্পাদনা - সুব্রত রাহা, অজয় দাস

৩২. তদেব

৩৩. গল্পকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী - সুমিতা চক্রবর্তী - কলেজ স্ট্রীট, ১৯৯৪, পৃ.৫৩

৩৪. ইন্টিকুটুম - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বাছাই গল্প, সম্পাদক - সুব্রত রাহা, অজয় দাশগুপ্ত

৩৫. তদেব

৩৬. মঙ্গলগ্রহ - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী - নির্বাচিত গল্প, সম্পাদক নিতাই বসু
পৃ.১৮২

৩৭. রস - নরেন্দ্রনাথ মিত্র, ১ম

৩৮. গাছ - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নির্বাচিত গল্প, সম্পাদক নিতাই বসু, পৃ.১৯৯

৩৯. গিরগিটি - তদেব, পৃ.১০৪

৪০. কাব্য বীজ ও কমলকুমার মজুমদার - বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, ১৯৮৫

৪১. কাব্যবীজ ও কমলকুমার মজুমদার - বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত - ১৯৮৫, পৃ.২৫৮-৫৯

৪২. ছোটগল্পের কথা - রথীন্দ্রনাথ রায় - পৃ.১২৮

৪৩. মল্লিকাবাহার - গল্প সমগ্র - কমলকুমার মজুমদার - সম্পাদক - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ.৫৭-৫৮

৪৪. জ্বালা - নির্বাচিত গল্প - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সম্পাদক - নিতাই বসু, পৃ.২৭৬-৭৮

৪৫. রস - নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা ১ম, পৃ.৩৬

৪৬. তদেব

৪৭. তাহাদের কথা গল্প সমগ্র - কমলকুমার মজুমদার - সম্পাদক - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ.৮৩

৪৮. কয়েদখানা - তদেব, পৃ.১৬৯

৪৯. ধূপকাঠি - নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা - ৪র্থ পৃ.৩১৫

৫০. তদেব, পৃ.৩২০

৫১. কয়েদখানা, গল্পসমগ্র, কমলকুমার মজুমদার - সম্পাদক - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
পৃ.

৫২. তদেব

৫৩. সবুজ মানুষের জন্ম - তপোব্রত ঘোষ, ভাঙা কাঁচের শিল্প, পৃ.১২৮
সম্পাদক - অর্জুন রায়।

৫৪. সোহাগিনী - নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা ৩য়, পৃ.৩১০

৫৫. রস - নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা ১ম, পৃ.৭১

৫৬. কয়েদখানা, গল্পসমগ্র - কমলকুমার মজুমদার, সম্পাদনা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

৫৭. কালের পুতুলিকা - অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃ.১২

৫৮. চন্দ্রমল্লিকা - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, পৃ.২৩১

৫৯. তাদের কথা - গল্প সমগ্র কমলকুমার মজুমদার, সম্পাদক - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ.১৮

৬০. তদেব

৬১. তদেব

৬২. তদেব